Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

কারবালার ইতিহাস

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

শেখ শাকিলা জাহান

রোলঃ ২২৮০২০২৩৪

২০ মে, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

কারবালার ইতিহাস

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

শেখ শাকিলা জাহান

রোলঃ ২২৮০২০২৩৪

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " কারবালার ইতিহাস " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে শেখ শাকিলা জাহান, আইডিঃ ২২৮০২০২৩৪ বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: জিল্লুর রহমান
তাজবীদ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " কারবালার ইতিহাস " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: জোবায়ের হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

শেখ শাকিলা জাহান

আইডিঃ ২২৮০২০২৩৪

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

২০ মে, ২০২৫ ইং

সূচিপত্র

ভূমিকা

সকল প্রশংসা শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য, যিনি বিশ্ব জাহানের প্রতিপালক। দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও তাঁর পরিবার এবং সকল সাহাবীর উপর। সৌভাগ্যবান শহীদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দৌহিত্র সায়্যেদ হোসাইন ইবনে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর কারবালার প্রান্তরে শহীদ হওয়াকে কেন্দ্র করে অনেক ঘটনাই প্রসিদ্ধ রয়েছে।

জান্নাতী যুবকদের সর্দার, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কলিজার টুকরা হযরত হোসাইন (রা) এবং তাঁর সাথীদের মর্মান্তিক ও হৃদয়বিদারক শাহাদাতের ঘটনা এমন নয় যে, যা কারও অন্তর থেকে কখনও মুছে যেতে পারে।শুধু মুসলমানই নয় বরং প্রতিটি মানুষই এই শাহাদাতের করুণ ঘটনায় আন্তরিকভাবে ব্যথিত ও মর্মাহত। এই শাহাদাতের ঘটনায়, চিন্তাশীল ও জ্ঞানীদের জন্য রয়েছে অনেক শিক্ষা ও উপদেশ।

পৃথিবীর যুদ্ধ-ইতিহাসে কারবালার যুদ্ধ একটি সামান্য ঘটনার কিন্তু ফলাফলের দিক দিয়া এটির গুরুত্ব ছিল অত্যাধিক। ইহা শুধু মদীনা, মক্কা ও কুফায় বিপ্লব আনে নাই, দামেস্কের উমাইয়া রাজবংশের পতনেও ইহার প্রত্যক্ষ প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়েছে।

কারবালার যুদ্ধ একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। কিন্তু ভক্তদের লেখনিতে ইহার অনেক অতিরঞ্জন ঘটিয়েছে।কবি-সাহিত্যিকেরা এটিকে উপকথার পর্যায়ে দাড় করিয়েছে। কাল্পনিক গল্পের অবতারণা দ্বারা মূল কাহিনীকে যথাসাধ্য মর্মস্পর্শী করার চেষ্টা চালিয়েছে। নারী ঘটিত প্রণয় কাহিনীও এতে সংযোজিত হইয়েছে।।এই সংক্রান্ত কাহিনী নিতান্তাই কাল্পনিক। মুহম্মদ হানাফিয়ার যুদ্ধে গমন ও ইয়াযিদের পশ্চাদ্ধাবন ইত্যাদি কিচ্ছারও কোন ভিত্তি নেই।

কারবালার যুদ্ধের পটভূমি

ইসলামের প্রাথমিক ইতিহাসে যে সকল শহর সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলো তন্মধ্যে মক্কার পরেই মদীনা, কুফা ও দামেস্ক অন্যতম।কারবালার মর্মান্তিক করুণ কাহিনীর সহিত এই তিনটি শহর বিশেষ ভাবে জড়িত। মদীনার পরিচয় অনাবশ্যক। এটি হিজায প্রদেশের পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত এবং মদীনা হতে প্রায় ছয় শত মাইল উত্তর-পূর্বে কুফা। এককালে এটি ইরাক প্রদেশের রাজধানী ছিল। ইরাকের পশ্চিমেই সিরিয়া। এটির রাজধানী দামেস্ক শহর মদীনা হতে প্রায় ৭০০ মাইল উত্তরে এবং কুফা হতে ৪০০ মাইল পশ্চিমে। এই তিনটি শহর যোগ করলে যে ত্রিভুজের সৃষ্টি হবে তার অন্তর্বতী যাবতীয় স্থান বালুকাময় মরুভূমি।

কুফার ইতিহাস বিচিত্র। ইসলামের অভ্যুত্থানের পূর্বে এটি একটি গণ্ডগ্রাম ছিল। কিন্তু কুফার বাজার ছিল একটি বিশিষ্ট বাণিজ্য কেন্দ্র। হিজায, সিরিয়া ও ইরান দেশের বণিকেরা এখানে পণ্য নিয়ে আসত। এই পথে অন্যত্র যাবার কালেও তারা কুফার মঞ্জিলে রাত্রি যাপন করত।এটির উত্তর-পূর্ব দিক দিয়ে প্রবাহিত বিখ্যাত ইউফ্রেটিস বা ফোরাত নদী। স্থানটি স্বাস্থ্যকর বলে পারস্য বিজয়ী সেনাপতি সা'দ পারস্যের পূর্বতন,রাজধানী মাদাইনের পরিবর্তে এইখানে বসে ইরাক, পূর্ব-আরব ও পারস্য দেশ শাসন করতেন। মাদাইন হতে বহু মণিমাণিক্য এনে তিনি তার এই নতুন রাজধানীকে সুসজ্জিত করেন। ক্রমে এটি একটি বৃহৎ নগরে পরিণত হয়। পরবর্তী কালে মুসলিম জাহানের চতুর্থ খলিফা হযরত আলী রদ্বিআল্লাহু আনহু মদীনা হতে এখানে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন এবং এই স্থানেই তিনি নিহত হন। এই কুফায় বসে ইয়াযিদ সেনাপতি কুখ্যাত উবায়দুল্লাহ ইবনে যিয়াদ কারবালায় ইমাম হুসাইনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করতেন।

কুফার প্রায় দুইশত মাইল দক্ষিণ-পূর্বে ফোরাত নদী টাইগ্রিসের সহিত মিলিত হয়েছে। উভয়ের সঙ্গমস্থলে অবস্থিত ইরাকের প্রসিদ্ধ বন্দর বসরা, পারস্য উপসাগরের মোহনা হতে প্রায় সত্তর মাইল উত্তরে। হযরত ওমর এই বন্দরের প্রতিষ্ঠা করেন, পূর্বদেশ সমূহের সহিত আরব জাতির বাণিজ্যের সুবিধার জন্য। কুফা হতে প্রায় সত্তর মাইল উত্তর-পূর্বে এবং বসরা হইতে প্রায় আড়াই শত মাইল উত্তরে, টাইগ্রীস নদীর উভয় তীরে, আরব্য উপন্যাসের স্বপ্নপুরী বাগদাদ নগরী অপূর্ব জৌলসে ঝলমল করছে। উহা আরব আযমের যোগসুত্র এবং সেমিটিক ও পারসিক সভ্যতার মিলন ক্ষেত্র। খৃষ্টের জন্মের অন্যূন তিন হাজার বৎসর পূর্বে এই ইরাক প্রদেশের উত্তর অঞ্চলে প্রাচীন এসীরীয় সাম্রাজ্য এবং দক্ষিণ অঞ্চলে প্রসিদ্ধ ব্যাবলনীয় সামাজ্য গড়ে উঠেছিলো। ইরাকের পশ্চিমেই পূর্ব সিরিয়ার বিস্তীর্ণ মরুভূমি ধু ধু করছে। এই দুস্তর মরুভূমির ভিতর মনুষ্য বসতি অতি বিরল। এই মরুভূমিই ফোরাত নদীর তীরবর্তী কারবালা প্রান্তরে গিয়া মিশেছে। কুফা হতে প্রায় চল্লিশ মাইল উত্তর-পশ্চিমে এবং ফোরাত নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত এই সেই ভয়াবহ প্রান্তর কারবালা, যার নামে আজও সারা বিশ্বের মুসলমান শিহরিয়া উঠে। বহু সামাজ্যের উত্থান-পতনের সাক্ষী এই ফোরাত নদী। এখানে ইহা দক্ষিণ বাহিনী। পরে এটি পূর্বাঞ্চলে কিঞ্চিৎ বাঁকিয়া ইরাকের বুক চিরে আবার দক্ষিণ মুখে সাগর সন্ধানে ছুটেছে। সিরিয়া দেশ প্রাচীন সভ্যতার লীলা ভূমি। পারসিকরা এটিকে মুল্কে শাম" বা শামদেশ বলত।দূর অতীতে কোনও সময়ে পারসিকদের অধীন থাকলেও ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে এটি দীর্ঘকাল বাইজেন্টাইন রোমক সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। রাজধানী দামেস্কের পূর্বপার্শ্ব দিয়া প্রবাহিত ক্ষুদ্র এক পার্বত্য নদী। নদীজলের স্বচ্ছ মুকুরে দামেস্কের

গগণচুম্বী সৌধমালা অহর্নিশ প্রতিবিম্বিত হচ্ছে। ইরাক যেমন প্রতিবেশী পারসিক সভ্যতা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলো।

সিরিয়ার জাতীয় জীবন তেমনি কনস্ট্যান্টিনোপলের রোমক আদর্শের দ্বারা অনুরঞ্জিত হয়েছিলো। দামেস্ক নগরীকে রোমকের বিলাস-ব্যসনের প্রমোদগারে পরিণত করেছিলো। ভোগবিলাসের যে উচ্ছৃঙ্খল মনোবৃত্তি একদা তথায় প্রশ্রয় পেয়েছিলো, ইসলামী শাসনে এসেও তা সংশোধনের অবকাশ ঘটে নাই। ইসলামী ভাবধারায় সিরিয়াবাসীদের মানসিকতা পূর্ণভাবে রূপান্তরিত হবার পূর্বেই খোলাফায়ে রাশেদীনের পতন ঘটে। ইসলামের অভিনব সংস্কৃতি ইরাকে দৃঢ় ভিত্তিক হতে পারে নাই দুইটি কারণে। এক. ইসলামের আন্তবিপ্লব. দ্বিতীয়, উমাইয়া প্রভুত্বের সম্প্রসারণ। মহানবীর চরিত্র প্রভাবে ত্যাগ, সংযম ও ভ্রাতৃত্বের যে মহান আদর্শ মদীনার বুকে বিকশিত হয়েছিল, তারপর উহার আন্তজ্যোতি ক্রমে নিষ্প্রভ হতে থাকে। সেই সুযোগে ইরাক ও সিরিয়ায় অতীতের ভোগবিলাস ও রাজসিকতার পুরাতন কঙ্কাল আবার নব কলেবরে সজীব হয়ে উঠে। মদীনার কৃষ্টি ছিল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র প্রকৃতির। পশ্চিম হিজাযের পর্বত মালার অঙ্কে পালিত এই শান্ত-সভ্য প্রাচীন নগরী আবহমানকাল হতে নিজের স্বাধীনতা ও বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে চলছে। পারসিকরা যখন আরব দেশ জয় করে তখনও মক্কা ও মদীনার লোকেরা তাদের স্বাধীনতা হারায় নাই। কারণ ইরান হতে সুদূরে অবস্থিত ও স্বল্প আয় বিশিষ্ট হিজায প্রদেশের শাসন সংরক্ষণের জন্য পারস্য সম্রাট কোনও দিন উৎকণ্ঠ প্রদর্শন করে নাই। ফলে মক্কার ন্যায় মদীনার লোকেরাও বরাবর নিজেদের শাসন-ব্যবস্থা নিজেরাই চালাইয়া যাইত।তারপর আসল ইসলামী নতুন যামানা। তখন নবীর আদর্শে, নবীর শিক্ষায়, এই অনুকূল ভূমিতে অঙ্কুরিত হলো এক নতুন সভ্যতা,নতুন মানবতা প্রতিষ্ঠিত হলো সেখানে এক নতুন রাষ্ট্র, যার বৈশিষ্ট্য ছিল-ব্যক্তির দিক দিয়া আত্মশুদ্ধি, ত্যাগ ও প্রেম এবং সমাজের দিক দিয়ে সাম্য, মৈত্রী এবং সেবা।

সিরিয়া ও ইরাকের রাজসিক আদর্শের প্রবল মোহ মদীনায় লালিত ইসলামী সাত্ত্বিক আদর্শকে ডুবিয়ে দেয়, এই আশঙ্কায় খোলাফায়ে রাশেদীনের শেষ স্তম্ব হযরত আলী, ৬৫৬ খৃষ্টাব্দে মদীনা হতে রাজধানী কুফায় স্থানান্তরিত করে নিজেকে দুই বিরোধী আদর্শের সংঘাত স্থলে স্থাপিত করেন। কিন্তু নিয়তির বিধান ছিল তাহার প্রতিকূলে। অল্প দিন যেতে না যেতে এক গুপ্ত ঘাতকের হাতে তার জীবনের অবসান ঘটে(৬৬১ খৃঃ, ৪০ হিঃ। হযরত আলী রদ্বিআল্লাহু তাআলা আনহুর এই অপ্রত্যাশিত মৃত্যুতে ইসলামী ত্যাগ ও সাত্ত্বিকতার যে 'মৌলিক' আদর্শ অকালে মুষড়িয়া পড়ে, বিশ বৎসর পরে নবীর প্রিয় দৌহিত্র ইমাম হুসাইনের ভিতর দিয়া সেই আদর্শ চেয়েছিলো পুনরায় পুনর্জোতিতে আত্মপ্রকাশ। কারবালার যুদ্ধ এবং হুসাইনের

আত্মদান ভোগ-বিলাসের শক্তির বিরুদ্ধে সেই সাত্ত্বিক আদর্শের সংঘাতের মর্মান্তিক পরিণতি। হুসাইন সে সংঘর্ষে জয়ী হইতে পারেন নাই, শহীদ হইয়াছিলেন। কিন্তু শহীদী খুনে তিনি ইসলামকে পুনর্জীবিত করে যান। বেঁচে থাকলে হয়ত যা করতে পারতেন না, জীবনের বিনিময়ে তিনি তা সম্পন্ন করে গেলেন। তিনি মরণজয়ী মহাপুরুষ। তার আত্মত্যাগের অপূর্ব কাহিনী যুগ যুগ ধরে বিশ্বের কাব্যে, ইতিহাসে, সাহিত্যে ও সঙ্গীতে গীত হবে এবং তার স্বজাতিকে ধর্মীয় চেতনায় উদ্বৃদ্ধ করতে থাকবে। কারবালা মুসলিম জাতিকে নতুন করে জিন্দা করবে।

চতুর্থ খলিফা হযরত আলি রদ্বিআল্লাহু তাআলা আনহু

উসমান রদ্বিআল্লাহু তাআলা আনহু নিহত হওয়ার পর মদিনা খিলাফতশূণ্য হয়ে পড়ে। বিদ্রোহীদের মিশরীয় নেতা গাফিকি বিন হারব-ই সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করছিল। মদিনাবাসী এ সময় কার্যত অসহায় হয়ে পড়েছিল। বিদ্রোহীরা যদিও খলিফা উসমান রাযি.কে হত্যার প্রশ্নে একজোট ছিল; কিন্তু নতুন খলিফা নির্বাচনের বিষয়ে তারা মতবিভক্ত ছিল। মিশরীয় বিদ্রোহীদের আগ্রহ ছিল আলি রাঃ এর প্রতি, বসরার বিদ্রোহীদের আগ্রহ ছিলো তালহা বিন উবায়দুল্লাহ রাযি.- এর প্রতি আর কুফার বিদ্রোহীদের আগ্রহ ছিলো যুবায়ের ইবনুল আওয়াম রাঃ এর প্রতি। কিন্তু তারা তিনজনই বিদ্রোহীদের প্রত্যাখ্যান করায় বিদ্রোহীরা এরপর সাদ বিন আবু ওয়াক্কাস রাঃ কে দায়িত্ব গ্রহণের প্রস্তাব দেয়। কিন্তু তিনি আরো কঠোর ভাষায় বিদ্রোহীদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। এদিকে ইসলামি রাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে খলিফার সহায়তায় আগত বাহিনীগুলো মদিনার কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিল। অবস্থা বেগতিক দেখে বিদ্রোহীরা মদিনাবাসীকে হুমকি প্রদান করে এবং দুদিন সময় দিয়ে বলে যে, এরমধ্যে মদিনাবাসী নতুন খলিফা নির্বাচিত করতে না পারলে তারা আলি ও যুবায়ের রাঃ সহ অনেককে হত্যা করবে। এরপর মদিনায় উপস্থিত বিশিষ্ট সাহাবায়ে কেরাম সর্বদিক বিবেচনা করে হজরত আলি রাঃ কেই সবচেয়ে উপযুক্ত বিবেচনা করে তাকে দায়িত্ব গ্রহণের অনুরোধ জানান। আলি রাঃ তা প্রত্যাখ্যান করলেও সকলে তাকে উম্মাহর এই চরম দুর্যোগপূর্ণ মুহূর্তে ইসলাম ও মুসলমানদের কল্যাণের দিকে তাকিয়ে বারবার অনুরোধ জানাতে থাকে। অবশেষে ২৫ জিলহজ সকলে তার হাতে বায়আত গ্রহণ করে। তার বায়আতের সংবাদ সমকালীন ইসলামি বিশ্বের সকল প্রান্তে বার্তা প্রেরণের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হলে শামের গভর্নর মুয়াবিয়া রাঃ ব্যতীত সকলে তার প্রতি আনুগত্যের ঘোষণা করে।

দায়িত্ব গ্রহণের পর হজরত আলি রাযি. প্রথমেই ইসলামি রাষ্ট্রের শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে মনোযোগী হন। তিনি বিভিন্ন অঞ্চলে নতুন গভর্নর প্রেরণ করেন এবং তাদের মাধ্যমে সকল স্থান থেকে তার খিলাফতের বায়আত গ্রহণ করেন। আলি রাঃ শামের গভর্নর মুয়াবিয়া রাঃ এর কাছে বায়আতের আহবান জানিয়ে বার্তা পাঠালে মুয়াবিয়া রাঃ উত্তর দিতে বিলম্ব করেন। মুয়াবিয়া রাঃপরিস্থিতি কোন দিকে গড়ায় এবং বিদ্রোহীরা সামনে কী পদক্ষেপ নেয়, তার অপেক্ষা করছিলেন। নূতন খলিফা কার্যভার গ্রহণ করিয়া কঠোর ন্যায়নিষ্ঠা সহকারে কুরআন ও শরীয়তের শাসন দ্বারা রাজ্যে শৃঙ্খলা স্থাপনে প্রয়াসী হলেন। হযরত ওসমানের নিয়োজিত গভর্ণরদের মধ্যে যারা দুর্নীতি পরায়ণ বলিয়া কুখ্যাত হয়েছিলো তাদেরকে পদচ্যুত করলেন। কিন্তু হযরত ওসমান মুসলিম রাষ্ট্রকে যে দারুণ অশান্তি ও বিক্ষোভের ভিতর ফেলে দিয়েছিলন। তার ইন্তেকালের পর তার প্রতিকার শুধু শাসন-ব্যবস্থার কড়াকড়ি দ্বারা সম্ভবপর ছিল না। এজন্য নতুন খলিফা জনগণের মানসিক পরিবর্তনেরও চেষ্টা করতে লাগলেন।

বসরার গভর্নর উসমান ইবনু হুনাইফ রা. নিজেই ইমরান ইবনু হুসাইন রা. ও আবুল আসওয়াদ দুআলিকে উন্মুল মুমিনিনের কাছে প্রেরণ করেন। উম্মুল মুমিনিন তাদের সাথে কথা বলেন। তার প্রতিটি অক্ষর, প্রতিটি শব্দ ও বাক্য থেকে ইখলাস ও নিষ্ঠা, কল্যাণকামিতা ও হৃদয়দগ্ধতা সুস্পষ্ট। তিনি বলেন: 'আমার মতো একজন নারী গোপন কোনো উদ্দেশ্যে এত দীর্ঘ যাত্রা করে না। শহরের উদ্ভ্রান্ত লোকেরা ও বিভিন্ন গোত্রের পথচ্যুত শ্রেণী মদিনাতুর রাসুলে আক্রমণ করেছে। আল্লাহ ও তার রাসুলের অভিশাপের যোগ্য তারা। অতঃপর তারা মুসলিমদের রাষ্ট্রপ্রধানকে কোনো অপরাধ কিংবা লুটতরাজাড়াই শহিদ করে দিয়েছে। অবৈধভাবে তাঁকে হত্যা করেছে। সাধারণ মানুষের ঘরবাড়ি দখল করেছে, সাধারণ মানুষ অস্থির ও চিন্তিত হয়ে পড়েছে। তারা নিজেদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে পারছে না। নিরাপত্তা বলতে কিছু নেই। পরিশেষে অমি উঠে নিড়িয়েছি মুসলিমদেরকে এসব ব্যাপারে সচেতন করার জন্য। আমরা আল্লাহ ও তার রাসুলের হুকুম মোতাবেক জাতির সংশোধনের লক্ষ্যে দাঁড়িয়েছি। আমরা তোমাদের সৎকাজের আদেশ দিই ও মন্দ কাজ থেকে বাধা প্রদান করি। এবং মন্দ কাজের সমাপ্তি ঘটানোর উৎসাহ দিই।' বসরার নেতৃবর্গীয় লোকেরা তালহা ও জুবাইর রা.-এর সাথেও সাক্ষাৎ করেন। তাদের অবস্থান সম্পর্কে অবগতি লাভের পর নেতারা আলি রা.-এর হাতে বাইআত হওয়ার কথা স্মরণ করিয়ে দেন।

কুফার দায়িত্বশীলদের প্রতি উম্মুল মুমিনিন যেসব চিঠি লিখেছিলেন সেখানে পুরো অবস্থার চিত্র এভাবে তুলে ধরেন: 'সজ্জনেরা আমার আহ্বানে সাড়া দিয়েছেন; কিন্তু যাদের কপালে কল্যাণ বলে কিছু নেই তারা অস্ত্র নিয়ে আমাদের মুখোমুখি হয়েছে। তারা বলছে, আমরা

তোমাদেরও উসমানের রাস্তায় পৌঁছে দেবো। আল্লাহ তাআলার নাযিলকৃত হুদুদকে তারা আরও বেশি অকার্যকর করে দেওয়ার প্রচেষ্টায় লিপ্ত। শত্রুতার চূড়ান্ত প্রদর্শনী করে তারা আমাদের কাফের বলে আখ্যা দিয়েছে। আমাদের বিরুদ্ধে বানোয়াট কথাবার্তা বলছে।

বসরার যুদ্ধ: সাবায়িদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ হুকাইম ইবনু জাবালাহ এবং তার মত দুষ্ট প্রকৃতির লোকদের কারণে ৩৬ হিজরির ২৪ ও ২৫ রবিউস সানি তারিখে মক্কি বাহিনী ও বসরার বিদ্রোহীদের মধ্যে একে একে দুটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়। উসমান রা.-এর হত্যাকারীরা ছাড়াও আবদুল কায়িস গোত্র ও রবিআ গোত্রের কিছু লোক এতে শামিল ছিল। এরা মূর্খতাবশত সন্ত্রাসীদের ধোকায় পড়ে গিয়েছিল। প্রথম দিন হুকাইম ইবন জাবালাহ অশ্বারোহী বাহিনী নিয়ে আয়িশা রা.-এর শিবিরের দিকে চলে যায়। শিবির পাতা হয়েছিল বসরার মসজিদের কাছাকাছি। অশ্বারোহীদের ঘোড়ায় চড়তে দেখেও মক্কী বাহিনী স্বেচ্ছায় যুদ্ধে এগিয়ে যায় নি। বর্শা হাতে তারা আত্মরক্ষার প্রস্তুতি গ্রহণ করে। অপরদিকে হুকাইম অশ্বারোহীদের উত্তেজিত করে সামনে এগিয়ে দিতে থাকে। উম্মুল মুমিনিনের নিরাপত্তাদাতা আত্মোৎসর্গী বাহিনীকে স্রেফ আত্মরক্ষার ভূমিকায় দেখে সে চিৎকার করে 'ভীরুতা আর ক্রোধের কারণে আজ কুরাইশি বাহিনী ধ্বংস হয়ে যাবে।' এভাবে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করে আয়িশা রা.-এর বাহিনীকে উসকে দেওয়ার চেষ্টা করে সে। তাদেরকে উন্মুক্ত ময়দানে যুদ্ধের প্রতি প্রলুব্ধ করার সমূহ চেষ্টা করে; কিন্তু আত্মোৎসর্গী বাহিনী আপন দূরদৃষ্টি কাজে লাগিয়ে এমন সিদ্ধান্ত গ্রহণ থেকে বিরত থাকে এবং নিজেকের সুদৃঢ় নিরাপত্তাব্যবস্থা ধরে রাখে। জামে মসজিদের গলিতে যুদ্ধ ও পাথর বর্ষণ হতে থাকে। শত্রু সামনে এগিয়ে আসার জোর চেষ্টা করে যাচ্ছিল। কুফাবাসীর নামে প্রেরিত চিঠিতে উম্মুল মুমিনিন লেখেন: 'ভোরবেলা তখনো আঁধার কাটে নি; এমন সময় তারা হামলা করে। তারা চাইছিল, আমাকে ও আমার সাথিদের হত্যা করবে। তারা আমার অবস্থানস্থলের উঠোন পর্যন্ত পৌঁছে যায়। তাদের সাথে একজন গাইড ছিল সে আমাকে দেখিয়ে দিচ্ছিল। কিন্তু দরজার কাছে তারা কয়েকজন প্রহরীকে প্রস্তুত পায়। ফলে যুদ্ধের চাকা উল্টো ঘুরতে শুরু করে। মুসলিমরা শত্রুদের ঘেরাও করে হত্যা করতে আরম্ভ করে।

আলী রদ্বিআল্লাহু তাআলা আনহুর-খিলাফত ও মৃত্যু

খলিফা হিসেবে আলি রাযি.-এর দায়িত্বগ্রহণঃ উসমান রদ্বিআল্লাহু তাআলা আনহু নিহত হওয়ার পর মদিনা খিলাফতশূণ্য হয়ে পড়ে। বিদ্রোহীদের মিশরীয় নেতা গাফিকি বিন হারব-ই সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করছিল। মদিনাবাসী এ সময় কার্যত অসহায় হয়ে পড়েছিল। বিদ্রোহীরা

যদিও খলিফা উসমান রাযি.কে হত্যার প্রশ্নে একজোট ছিল; কিন্তু নতুন খলিফা নির্বাচনের বিষয়ে তারা মতবিভক্ত ছিল। মিশরীয় বিদ্রোহীদের আগ্রহ ছিল আলি রাঃ এর প্রতি, বসরার বিদ্রোহীদের আগ্রহ ছিলো তালহা বিন উবায়দুল্লাহ রাযি.- এর প্রতি আর কুফার বিদ্রোহীদের আগ্রহ ছিলো যুবায়ের ইবনুল আওয়াম রাঃ এর প্রতি। কিন্তু তারা তিনজনই বিদ্রোহীদের প্রত্যাখ্যান করায় বিদ্রোহীরা এরপর সাদ বিন আবু ওয়াক্কাস রাঃ কে দায়িত্ব গ্রহণের প্রস্তাব দেয়। কিন্তু তিনি আরো কঠোর ভাষায় বিদ্রোহীদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। এদিকে ইসলামি রাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে খলিফার সহায়তায় আগত বাহিনীগুলো মদিনার কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিল। অবস্থা বেগতিক দেখে বিদ্রোহীরা মদিনাবাসীকে হুমকি প্রদান করে এবং দুদিন সময় দিয়ে বলে যে, এরমধ্যে মদিনাবাসী নতুন খলিফা নির্বাচিত করতে না পারলে তারা আলি ও যুবায়ের রাঃ সহ অনেককে হত্যা করবে। এরপর মদিনায় উপস্থিত বিশিষ্ট সাহাবায়ে কেরাম সর্বদিক বিবেচনা করে হজরত আলি রাঃ কেই সবচেয়ে উপযুক্ত বিবেচনা করে তাকে দায়িত্ব গ্রহণের অনুরোধ জানান। আলি রাঃ তা প্রত্যাখ্যান করলেও সকলে তাকে উম্মাহর এই চরম দুর্যোগপূর্ণ মুহূর্তে ইসলাম ও মুসলমানদের কল্যাণের দিকে তাকিয়ে বারবার অনুরোধ জানাতে থাকে। অবশেষে ২৫ জিলহজ সকলে তার হাতে বায়আত গ্রহণ করে। তার বায়আতের সংবাদ সমকালীন ইসলামি বিশ্বের সকল প্রান্তে বার্তা প্রেরণের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হলে শামের গভর্নর মুয়াবিয়া রাঃ ব্যতীত সকলে তার প্রতি আনুগত্যের ঘোষণা করে।

দায়িত্ব গ্রহণের পর হজরত আলি রাযি. প্রথমেই ইসলামি রাষ্ট্রের শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে মনোযোগী হন। তিনি বিভিন্ন অঞ্চলে নতুন গভর্নর প্রেরণ করেন এবং তাদের মাধ্যমে সকল স্থান থেকে তার খিলাফতের বায়আত গ্রহণ করেন। আলি রাঃ শামের গভর্নর মুয়াবিয়া রাঃ এর কাছে বায়আতের আহবান জানিয়ে বার্তা পাঠালে মুয়াবিয়া রাঃ উত্তর দিতে বিলম্ব করেন। মুয়াবিয়া রাঃপরিস্থিতি কোন দিকে গড়ায় এবং বিদ্রোহীরা সামনে কী পদক্ষেপ নেয়, তার অপেক্ষা করছিলেন। নূতন খলিফা কার্যভার গ্রহণ করিয়া কঠোর ন্যায়নিষ্ঠা সহকারে কুরআন ও শরীয়তের শাসন দ্বারা রাজ্যে শৃঙ্খলা স্থাপনে প্রয়াসী হলেন। হযরত ওসমানের নিয়োজিত গভর্ণরদের মধ্যে যারা দুর্নীতি পরায়ণ বলিয়া কুখ্যাত হয়েছিলো তাদেরকে পদচ্যুত করলেন।

জামাল যুদ্ধ (উটের যুদ্ধ)

৩৫ হিজরীর যিলহজ্জ মাসে ওসমান (রাঃ) বিদ্রোহীদের হাতে শাহাদত বরণ করলে লোকেরা আলী (রাঃ)-এর হাতে বায়‘আত গ্রহণ করে। বিদ্রোহীরাও আলী (রাঃ)-এর হাতে বায়‘আত

নেয়। আলী (রাঃ) প্রথমে রাষ্ট্রীয় শৃংখলা ফিরিয়ে আনার পরিকল্পনায় এবং বিদ্রোহীদের সংখ্যাধিক্যের কারণে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে কিছুটা বিলম্ব করেন। এতে কেউ কেউ আলী (রাঃ)-এর প্রতি রুষ্ট হন। অন্যদিকে হজ্জের মওসুম হওয়ায় রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর স্ত্রীগণ সহ বহু সাহাবী হজ্জব্রত পালনে মক্কায় ছিলেন। এভাবে চার মাস অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার পর তালহা ও যুবায়ের (রাঃ) মক্কায় গমন করেন। সেখানেই ওসমান হত্যার ক্বিসাস গ্রহণের প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য বসরায় যাওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং আয়েশা (রাঃ), তালহা, যুবায়ের প্রমুখ সাহাবী বসরার পথে রওয়ানা হন।

পথিমধ্যে আয়েশা (রাঃ) বসরার নিকটবর্তী ‘হাওআব’ (ماء الحوأب) নামক স্থানে পৌঁছলে কুকুর ঘেউ ঘেউ করতে থাকে। তখন তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীসের কথা মনে পড়ে যায়। একদা রাসূল (ছাঃ) তাঁকে বলেন, كَيْفَ بِإِحْدَاكُنَّ تَنْبَحُ عَلَيْهَا كِلاَبُ الْحَوْأَبِ ‘তোমাদের মধ্যকার একজনের অবস্থা কেমন হবে, যখন হাওআবের কুকুর তার বিরুদ্ধে ঘেউ ঘেউ করবে? (হাকেম হা/৪৬১৩; আহমাদ হা/২৪২৯৯; ছহীহাহ হা/৪৭৪)। অন্য বর্ণনায় এসেছে, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

أَيَّتُكُنَّ صَاحِبَةُ الْجَمَلِ الْأَدْبَبِ، تَخْرُجُ فَيَنْبَحُهَا كِلَابُ حَوْأَبٍ، يُقْتَلُ عَنْ يَمِينِهَا وَعَنْ يَسَارِهَا قَتْلَى كَثِيرٌ، ثُمَّ تَنْجُو بَعْدَمَا كَادَتْ-
‘তোমাদের মধ্যে উটে আরোহণকারিনীর অবস্থা কি হবে, যখন সে বের হবে? অতঃপর তার বিরুদ্ধে হাওআবের কুকুরগুলি ঘেউ ঘেউ করবে? তার ডানে ও বামে বহু মানুষ নিহত হবে। এরপর কোন মতে সে প্রাণে রক্ষা পাবে।তখন আয়েশা (রাঃ) বাড়িতে ফিরে যাওয়ার মনস্থ করলেন। এমন সময় যুবায়ের (রাঃ) বললেন, না বরং আপনি সামনে অগ্রসর হন। লোকেরা আপনাকে দেখে হয়ত সন্ধিতে চলে আসবে। আল্লাহ আপনার মাধ্যমে হয়ত বিবাদমান দু’টি দলের (আলী ও মু‘আবিয়া) মধ্যে মীমাংসা করে দিবেন। তখন তিনি সামনে অগ্রসর হন।

অন্যদিকে তাদের এই পদক্ষেপকে আলী (রাঃ) খেলাফতের অখন্ডতার জন্য হুমকি মনে করেন এবং সেনাবাহিনী সহ বছরার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। অনেক প্রসিদ্ধ সাহাবী তাঁর এই পদক্ষেপ থেকে নিজেদের দূরে রাখেন। এমনকি হাসান বিন আলী (রাঃ) স্বীয় পিতাকে এ পদক্ষেপ থেকে ফিরানোর জন্য বহু চেষ্টা চালিয়ে ব্যর্থ হন।

আলী (রাঃ) প্রথমে আয়েশা, তালহা ও যুবায়ের (রাঃ)-এর নিকটে কা‘কা‘ বিন আমরকে মুসলমানদের ঐক্য অটুট রাখা ও ভ্রাতৃত্বের আহবান নিয়ে প্রেরণ করেন। এসময় আয়েশা

(রাঃ) জবাব দেন যে, আমরা মুসলমানদের মধ্যে মীমাংসা করতে এসেছি। কা'কা' বিন আমর উক্ত সংবাদ আলী (রাঃ)-এর নিকট পেশ করলে তিনি খুশী হন। আয়েশা (রাঃ) আলীর নিকট দূত পাঠিয়ে বলেন যে, আমরা যুদ্ধের জন্য আসিনি। বরং মীমাংসার জন্য এসেছি। এরপর আলী (রাঃ) লোকদের শান্ত করতে বিভিন্ন ঘটনা স্মরণ করিয়ে বক্তব্য দেন। যাতে তিনি বলেন, আমরা আগামীকাল চলে যাব, ওসমান হত্যায় যারা জড়িত তারা ব্যতীত সকলে আমাদের সাথে যাবে।

এতে ফিৎনাবাজ আশতার, শুরাইহ বিন আওফা, আব্দুল্লাহ বিন সাবা ও ওসমান হত্যার সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত আড়াই হাজার লোক ভীত হয়ে গোপন চক্রান্তে লিপ্ত হয় (এদের মধ্যে কোন সাহাবী ছিলেন না)। প্রথমে তারা আলী (রাঃ)-কে হত্যার পরিকল্পনা করে। কিন্তু তা অসম্ভব দেখে অন্য ষড়যন্ত্র করে। রাত্রে যখন সবাই ঘুমিয়ে পড়ে, তখন তারা তালহা ও যুবায়ের (রাঃ)-এর বাহিনীর উপর হামলা করে এবং ফজরের পূর্বেই পালিয়ে যায়। এতে তাঁরা মনে করেন যে, এটি আলী (রাঃ)-এর বাহিনী করেছে। ফলে উভয় দলের মধ্যে অনাকাংখিত যুদ্ধ বেধে যায়। আয়েশা (রাঃ) যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য উটের উপর আরোহণ করে ময়দানে অবতীর্ণ হন। কিন্তু খারেজীরা তাঁর বাহনের পায়ে তীর মারলে তিনি নিচে পড়ে যান। পরে তাঁকে নিরাপদ স্থানে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

এ যুদ্ধের মূল কারণ ছিল ওসমান হত্যার বিচার থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য হত্যাকারীদের নিকৃষ্ট ষড়যন্ত্র। আয়েশা (রাঃ) এই অনাকাংখিত যুদ্ধের জন্য অনুতপ্ত হয়ে ইবনু ওমর (রাঃ)-কে বলেন, হে আবু আব্দুর রহমান! আপনি আমাকে উটের যুদ্ধে যেতে বাধা দেননি কেন? উত্তরে তিনি বলেন, আপনার উপর এক ব্যক্তি (অর্থাৎ ইবনু যুবায়ের) প্রভাব বিস্তার করেছিল, এজন্য কিছু বলিনি। তিনি বলেন, আল্লাহর কসম! আপনি নিষেধ করলে আমি যেতাম না।

অপরদিকে আলী (রাঃ) যুদ্ধের ভয়াবহতা দেখে বলেছিলেন, হায় যদি আমি এর বিশ বছর পূর্বে মারা যেতাম!। আলী (রাঃ) এজন্য অনুতপ্ত হন এবং বার বার আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। অন্যদিকে যুবায়ের (রাঃ) যুদ্ধ ত্যাগ করে উপত্যকায় চলে যান। তাঁকে ঘুমন্ত অবস্থায় আমর বিন জুরমূয হত্যা করে। আলী (রাঃ) জানতে পারলে দুঃখ করে বলেন, হে যুবায়ের-এর হত্যাকারী! তুমি জাহান্নামের দুঃসংবাদ গ্রহণ কর (হাকেম হা/৫৫৮০; আহমাদ হা/৭৯৯, সনদ হাসান)। আর তালহা (রাঃ) জনৈক ব্যক্তির তীরের আঘাতে নিহত হ'লে আলী (রাঃ) নিহতদের মধ্যে তাকে দেখতে পান। তখন তিনি তাঁর মুখমন্ডল থেকে ময়লা সরাতে সরাতে বলেছিলেন, হে আবু মুহাম্মাদ! আপনার প্রতি আল্লাহর রহমত নাযিল হোক। আকাশের

তারকারাজির নিচে আপনাকে এ অবস্থায় দেখাটা আমার জন্য খুবই কষ্টকর' (আল-বিদায়াহ ৭/২৪৭)।

ইমাম ইবনু তাইমিয়াহ (রহঃ) বলেন, আয়েশা (রাঃ) যুদ্ধ করেননি এবং যুদ্ধ করার জন্য বেরও হননি। বরং তিনি মুসলমানদের মধ্যে মীমাংসা করার জন্য বের হয়েছিলেন। কারণ তিনি মনে করেছিলেন যে, তার বের হওয়াতে মুসলমানদের কল্যাণ রয়েছে। পরে তিনি বুঝতে পারেন যে, তাঁর বের না হওয়াতেই কল্যাণ ছিল। সেজন্য জঙ্গে জামালে যাওয়ার কথা স্মরণ হ'লে তিনি এতো বেশী কাঁদতেন যে, তাঁর ওড়না ভিজে যেত।...অনুরূপভাবে ত্বালহা, যুবায়ের ও আলী (রাঃ) এই অনাকাংখিত যুদ্ধের জন্য অনুতপ্ত হন। কারণ এটি তাঁদের কারোরই এখতিয়ারাধীন ছিল না।

মনে রাখা আবশ্যক যে, সাহাবায়ে কেরামের মতভেদগত বিষয়ে চুপ থাকাই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের নীতি। কেননা রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমার সাহাবীদের ব্যাপারে তোমরা চুপ থাকো।

সিফফিনের যুদ্ধ

[সফর, ৩৭ হিজরি][জুলাই, ৬৫৭ খ্রিষ্টাব্দ] হজরত মুয়াবিয়া রাঃ) খলিফা উমর রাঃ-এর শাসনামল হতেই শামের গভর্নর ছিলেন। তিনি যখন দেখতে পান যে, একদিকে উসমান-হত্যার বিচারের কার্যকর কোন পদক্ষেপ গৃহীত হচ্ছে না, অপরদিকে বিচারের দাবিদার আন্দোলনকারীগণ বসরায় সমবেত হওয়ার পর উটের যুদ্ধের ন্যায় বেদনাদায়ক ঘটনা সংঘটিত হয়েছে, তখন তিনি বায়আতের বিষয়ে আরও বিলম্ব করার সিদ্ধান্ত নেন। অপরদিকে আলি রাযি.-এর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল- যেহেতু তিনি এখন ইসলামি রাষ্ট্রের বৈধ খলিফা এবং অন্যান্য অঞ্চলের প্রশাসন ও জনগণ ইতিমধ্যে তার খিলাফতের বায়আত গ্রহণ করেছে, তাই ইসলামি খিলাফতের অধীনস্থ একটি অঞ্চলের গভর্নর হিসেবে মুয়াবিয়া রাযি.-এর কর্তব্য তার বায়আত গ্রহণ করা। অবশেষে ৩৭ হিজরি সনের মুহাররম মাসে খলিফা আলি রাযি.শামের গভর্নর-পদ হতে মুয়াবিয়া রাযি.-কে অপসারণ করেন। কিন্তু মুয়াবিয়া রাযি. খলিফার নির্দেশ প্রত্যাখ্যান করেন। বাধ্য হয়ে খলিফা আলি রাযি. তার বাহিনী নিয়ে কুফা থেকে মুয়াবিয়া রাযি.-এর মোকাবিলায় রওনা হন। মুয়াবিয়া রাযি.-ও নিজ বাহিনী নিয়ে শাম থেকে বের হয়ে আসেন। ষড়যন্ত্রকারীদের একটি দলও তার বাহিনীর সঙ্গে যোগ দেয়। যুদ্ধের পূর্বে আলি রাযি, নিজ অবস্থানের স্বপক্ষে যুক্তিসমূহ উল্লেখ করে মুয়াবিয়া রাযি.-এর কাছে বার্তাবাহক প্রেরণ করেন।

কিন্তু মুয়াবিয়া রাযি, তা মেনে না নেওয়ায় সমঝোতার পথ বন্ধ হয়ে যায়। সিফফিনের কাছে উভয় বাহিনী যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। বিশিষ্ট সাহাবি আম্মার বিন ইয়াসির রাখি, মুয়াবিয়া রাযি.-এর বাহিনীর হাতে নিহত হন। নবীজি আম্মার বিন ইয়াসির রাযি.-কে বলেছিলেন তোমাকে বিদ্রোহী দল হত্যা করবে। ফলে এতদিন যারা শামি বাহিনির সাথে যুদ্ধে শরিক হতে দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন এবং সতর্কতা অবলম্বন করে চলছিলেন, তার শাহাদাতের পর তাদেরও আর সংশয় থাকল না। এমনিতেই ইরাকি বাহিনীর আক্রমণ অভাবনীয় প্রচণ্ড আকার ধারণ করেছিল। তখন পর্যন্ত খুযাইমা ইবনু সাবিত রা. তরবারি কোষবদ্ধ করে রেখেছিলেন। রাসুলের উপর্যুক্ত ভবিষ্যদ্বাণী তিনি শুনেছিলেন। তিনি বলছিলেন, 'আম্মার শহিদ হওয়ার আগপর্যন্ত আমি তরবারি কোষমুক্ত করবো না। আম্মার রা. শহিদ হওয়ার সাথে সাথে তিনি তরবারি উন্মুক্ত করেন এবং লড়াই করতে করতে শহিদ হয়ে যান। আম্মার ইবনু ইয়াসির রা.-এর শাহাদাত মুআবিয়া-বাহিনীর সামনে এক কঠিন প্রশ্ন দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল। অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি সে সময় শামি বাহিনীর দল ত্যাগ করে আলি রা.-এর বাহিনীতে যোগ দেন। তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন জুবাইদ ইবনু আবদ খাওলানি রহ. এবং উমার রা.-এর আজাদকৃত গোলাম হুনাই রহ.। আমর ইবনু হাযম রা. তৎক্ষণাৎ এই সংবাদ আমর ইবনুল আস রা.-কে দেন। তিনি ঘাবড়ে যান। মুআবিয়া রা.-এর কাছে উপস্থিত হয়ে আম্মার রা.-এর শাহাদাতের সংবাদ দেন এবং 'বিদ্রোহী বাহিনী'র হাদিসটি স্মরণ করিয়ে দেন। হাদিসটি প্রমাণ করছিল, আলি রা. আপন ইজতিহাদে হকের পক্ষে আছেন এবং মুআবিয়া রা. ভুলের মধ্যে আছেন। কিন্তু মুআবিয়া রা.-এর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, 'বিদ্রোহী বাহিনী' দ্বারা উদ্দেশ্য আমরা নই। আমরা তো উসমান রা. এর কিসাস গ্রহণের জন্য লড়াই করে যাচ্ছি। হয়তো তার সামনে রাসুলের ওই হাদিসটি ছিল যেখানে তিনি উসমান রা: সম্পর্কে বলেছিলেন, 'তার পায়ের নিচে (অর্থাৎ হার তিরোধানের পর) এক ফিতনার উদ্ভব হবে। সেসময় যারা তার অনুসারী হবে তারাই হকের পক্ষে থাকবে। সুতরাং মূল মর্মকে এড়িয়ে গিয়ে তিনি আমর ইবনুল আস রা.-কে বলেন: 'তাকে কি আমরা হত্যা করেছি? তাকে তো হত্যা করেছে আলি রা. ও তার সাথিরা। তারা তাকে নিয়ে এসেছে এবং আমাদের বর্শার সম্মুখে ঠেলে দিয়েছে।' এটা তো সুস্পষ্ট যে, মুআবিয়া রা.-এর এই ব্যাখ্যা বাস্তবে সঠিক নয়; কিন্তু এই ঘটনায় আম্মার রা.-এর শাহাদাতে আমর ইবনুল আস রা. ও মুআবিয়া রা.-এর চরম অস্থিরতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। উল্লেখ্য, একবার আম্মার রা. কঠিন অসুস্থতার সময়ে বলেছিলেন, 'আমি এই অসুখে মরবো না: প্রিয় রাসুল আমাকে বলে গিয়েছেন, 'দুটি মুমিন দলের মাঝখানে আমাকে হত্যা করা হবে। এভাবে আমার মৃত্যু হবে। বোঝা যায়, সিফফিনে যুদ্ধরত দুটি দলই ছিল ঈমানদার ও ন্যায়নিষ্ঠাবান। আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে এর যুদ্ধ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। তিনি উত্তরে বলেছিলেন তাদের নিহত ব্যক্তিরা ও আমাদের নিহত ব্যক্তিরা জান্নাতি। বিষয়টি আমার ও মুয়াবিয়ার

উপর নির্ভর করবে। একপর্যায়ে জয়ের পাল্লা আলি রাযি.-এর দিকে হেলে পড়ে এবং মুয়াবিয়া রাযি.-এর বাহিনী পরাজয়ের বরণ করে।

খারিজি সম্প্রদায়ের আত্মপ্রকাশ

আলি রাযি.-এর বাহিনীর বারো হাজার সৈন্যের একটি দল মধ্যস্থতার মূল প্রক্রিয়াকেই প্রত্যাখ্যান করে বাহিনী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। অথচ ইতিপূর্বে তারাই আলি রাযি.-কে মধ্যস্থতার প্রস্তাব মেনে নিতে বাধ্য করেছিল। তারা দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েই ক্ষান্ত না হয়ে মধ্যস্থতার প্রস্তাব মেনে নেওয়ায় হজরত আলিকে কাফির সাব্যস্ত করে। বিচ্ছিন্ন বাহিনী কুফায় পৌছে হারুরা নামক গ্রামে অবতরণ করে। এ কারণে বিচ্ছিন্নতাবাদী এ দলটিকে হারুরিয়া নামে অভিহিত করা হয়। তবে তাদের প্রসিদ্ধ নাম হলো খারিজি সম্প্রদায়। হজরত আলি রাযি.ও অন্যান্য ফকিহ সাহাবিগণ তাদেরকে এ বিষয়ে শরিয়তের দৃষ্টিভঙ্গি বাঝোনারে চেষ্টা করেন; কিন্তু তারা ছিল চরম নির্বোধ প্রকৃতির বেদুইন গোষ্ঠী। নিজেদের মাথায় যা ধরত, তারা কেবল তা-ই বুঝত; কোনো যুক্তিতর্ক মানার মনোভাব তাদের মধ্যে ছিল না। তারা মানুষকে সালিশের বিষয়ে জিজ্ঞেস করত; যে এর পক্ষে বলত, তাকেই তারা মুরতাদ ও কাফির গণ্য করে হত্যা করত। দলিলপ্রমাণ ও যুক্তিতর্কের মাধ্যমে খারিজি সম্প্রদায়কে সুপথে আনার প্রচেষ্টা যখন ব্যর্থ প্রমাণিত হয়, তখন বাধ্য হয়ে হজরত আলি রাযি, ৩৮ হিজরি সনে তাদের দমনে যুদ্ধ শুরু করেন। বহু খারিজি নিহত হয়, অনেকে পালিয়ে বিভিন্ন স্থানে আশ্রয় নেয়। পরবর্তীকালে খারিজিরা বিভক্ত হয়ে বিচ্ছিন্ন বিশটি উপদলে পরিণত হয়। ৩৯ হিজরি সনে আলি রাযি. ও মুয়াবিয়া রাযি. পরস্পর যুদ্ধবিরতির সন্ধিচুক্তিতে আবদ্ধ হন। উভয়ের ঐকমত্যে সিদ্ধান্ত হয়, মুয়াবিয়া রাযি. -ই শামের গভর্নর থাকবেন, আমিরুল মুমিনিন শামে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করবেন না। ৪০ হিজরিতে খারিজিরা আমিরুল মুমিনিন আলি রাযি.শামের গভর্নর মুয়াবিয়া রাযি. ও (তাদের দৃষ্টিতে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে অপরাধী) আমর ইবনুল আস রাযি.-কে হত্যা করে নিজেদের কর্তৃত্ব

প্রতিষ্ঠা করার সিদ্ধান্ত নেয়। তারা উল্লিখিত তিন মহান সাহাবিকে হত্যা করার জন্য তিনজন গুপ্তঘাতককে দায়িত্ব দেয়। আলি রাযি.-কে হত্যার দায়িত্ব দেওয়া হয় আবদুর রহমান বিন মুলজিমকে, মুয়াবিয়া রাযি.-কে হত্যা করার দায়িত্ব দেওয়া হয় বুরাক বিন আবদুল্লাহকে আর আমর ইবনুল আস রাযি.-কে হত্যা করার দায়িত্ব দেওয়া হয় আমর বিন বকর তামিমিকে। সিদ্ধান্ত হয়, তিন গুপ্তঘাতক ১৭ রমজান ফজর নামাজের সময় তাদেরকে হত্যা করবে। কিন্তু

তিন গুপ্তঘাতকের মধ্যে কেবল একজনই তার দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম হয়। ৪০ হিজরি সনের ১৭ রমজান (৬৬১ খ্রিষ্টাব্দের ২৪ জানুয়ারি)। প্রতিদিনের অভ্যাসমতো খলিফা আলি রাযি. ফজরের পূর্বে সকলকে জাগ্রত করতে ঘর থেকে বের হন। কুফার মসজিদের দরজায় ওত পেতে ছিল খারিজি গুপ্তঘাতক। আলি রাযি. মসজিদের কাছে পৌঁছতেই গুপ্তঘাতক তার ওপর হামলা চালায়। আহত খলিফা চিৎকার করে বলে ওঠেন, 'কাবার রবের শপথ! আমি তাতে সফলকাম!' লোকজন দ্রুত ছুটে এসে ঘাতককে ধরে ফেলে। খলিফার তখন অন্তিম মুহূর্ত সন্নিকটে। তাকে জিজ্ঞেস করা হয়, ঘাতককে কী করা হবে? আলি রাযি. উত্তর দেন, যদি আমি বেঁচে থাকি, তাহলে করণীয় আমিই নির্ধারণ করব। আর যদি আমি মারা যাই, তাহলে করণীয় নির্ণয়ের অধিকার তোমাদের। তোমরা যদি কিসাস গ্রহণেরই সিদ্ধান্ত নাও, তাহলে এক আঘাতের পরিবর্তে এক আঘাতই করবে; আর যদি তাকে ক্ষমা করে দাও, তাহলে তা-ই তাকওয়ার নিকটতর দাবি।ইসলামের চতুর্থ খলিফা হজরত আলি রাযি. তেষট্টি বছর বয়সে ৪০ হিজরির ২১ রমজান (৬৬১ খ্রিষ্টাব্দের ২৮ জানুয়ারি) কুফায় ইন্তেকাল করেন।

হাসান ইবন আলি রা.-এর খিলাফাত ও মৃত্যু

আলি রা. কোনো স্থলাভিষিক্ত নির্ধারণ করে না গেলেও তার শাহাদাতের পর মুসলিম-বিশ্বে পুত্র হাসান রা. থেকে অধিক মর্যাদাশীল ও উন্নত বংশীয় আর কেউ ছিল না। এই নাতির সাথে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এমন ভালোবাসা ছিল যে, কয়েকবার তিনি বলেছেন, 'হে আল্লাহ, আমি হাসানকে ভালোবাসি; আপনিও তাকে ভালোবাসেন। যে হাসানকে ভালোবাসে তাকেও আপনি ভালোবাসেন। সাহাবিগণ বলতেন, রাসুলে আকরামের সাথে সবচেয়ে বেশি সাদৃশ্যপূর্ণ ছিল হাসান। রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যদ্বাণীও সবার স্মরণ ছিল: 'আমার এই নাতি একদিন নেতা হবে। আশা করি, আল্লাহ তাআলা তার মাধ্যমে উম্মতের দুটি বিরাট দলের মধ্যে সন্ধি করে দেবেন। ফলে কুফার শীর্ষনেতাদের আশা ছিল হাসান রা.-এর খিলাফাত উম্মাহর জন্য অত্যন্ত কল্যাণকর প্রমাণিত হবে। তাই অতি দ্রুত তারা হাসান রা.-এর হাতে বাইআতনগ্রহণে একমত হয়ে যান। তাদের অনুরোধের মুখে হাসান রা. প্রথমে চুপ থাকলেও পরবর্তী উম্মাহর কল্যাণচিন্তা থেকে তিনি বাইআত নেওয়া শুরু করেন। সর্বপ্রথম বাইআত হন কায়িস ইবনু সাদ ইবনি উবাদা রা.। তিনি ছিলেন কুফা বাহিনীর সেনাপতি। খিলাফাতের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেওয়ার পর প্রথম যে খুতবা তিনি দিয়েছিলেন তার একটি শব্দ দ্বারা স্পষ্ট হয়ে যায়, উম্মাহর কল্যাণ ও নেতৃত্বের

জন্য রক্তপাত করার ব্যাপারে তিনি খুবই অসন্তুষ্ট ছিলেন। ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল রহ. কর্ণনা করেন: 'আলি রা.-কে হত্যা করার পর লোকেরা মাদায়েনে হাসান রা.-এর নিকট একত্র হয়। হাসান রা. জনতার মাঝে বক্তৃতা করেন। হামদ ও সানার পর তিনি বলেন, 'যা কিছু হওয়ার অতি শীঘ্র তা হবে। এবং লোকেরা পছন্দ করুক বা না করুক, নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাআলার সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত হবে। আল্লাহর কসম, যেদিন থেকে

আমি উপকারী ও অপকারী কাজগুলোর ব্যবধান বুঝতে শিখেছি সেদিন থেকে এমন কোনো সর্ষে পরিমাণ কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করা আমার চূড়ান্ত অপছন্দ যেখানে মুহাম্মাদ। সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর উম্মতের কোনো একজন সদস্যের এক ফোঁটা রক্ত ঝরাতে হয়।

আলি রা.-এর শাহাদাতের পর মুআবিয়া রা. ইলিয়া অঞ্চলে (বাইতুল মাকদিস) শামবাসীর থেকে খিলাফাতের বাইআতগ্রহণ শুরু করেছিলেন এবং তাকে আমিরুল মুমিনিন বলা শুরু হয়েছিল। এটা ছিল মুসলিম-বিশ্বের রাজনীতিতে একটি নতুন পরিবর্তন। কেননা, আলি রা.-এর জীবদ্দশায় মুআবিয়া রা. খিলাফাতের দাবি করেন নি। তখন তাকে কেবল 'আমির' বলা হতো। খিলাফাতের দুজন দাবিদার থাকা অবস্থায় ঐক্য পুনরুজ্জীবিত করার মাত্র তিনটি উপায় ছিল- ১. শামবাসী হাসান রা.-এর হাতে বাইআত হবে। ২. শামিদের সাথে যুদ্ধ করে তাদের একক খিলাফাতের অধীনে নিয়ে আসার চেষ্টা করা হবে। ৩. খিলাফাতের দায়িত্ব ত্যাগ করে মুআবিয়া রা.-কে খলিফা মেনে নেওয়া হবে। শামিরা যদি বাইআত হওয়ার লোক হতো তাহলে আলি রা.-এর হাতেই বাইআত হয়ে যেত। সুতরাং প্রথম পন্থা সম্ভব ছিল না। এবার হাসান রা.-এর সম্মুখে বিরাট পরীক্ষা এসে দাঁড়িয়েছিল; এমন স্পর্শকাতর মুহূর্তে তিনি কী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন! এমন পরিস্থিতিতে হাসান রা. সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, উম্মাহকে ঐক্যবদ্ধ করার লক্ষ্যে তিনি নিজের নেতৃত্ব বিসর্জন দিতে পিছপা হবেন না। এই সিদ্ধান্তের পেছনে কোনো ভীরুতা বা দুর্বলতা ছিল না। বিশুদ্ধ বর্ণনা অনুসারে পরিপূর্ণ শক্তি ও স্বাধীনতা হাতে থাকার পরও তিনি এই কর্মপন্থা গ্রহণ করেছিলেন। যেসকল বর্ণনা প্রমাণ করে যে, আপন সেনাদের দুর্বলতা ও অবাধ্যতায় বিরক্ত হয়ে তিনি মুআবিয়া রা.-এর সাথে সন্ধির সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, সেগুলো দুর্বল রাবি থেকে বর্ণিত। হ্যাঁ, তার বাহিনীতে এমন কিছু লোক ছিল-যারা শামিদের সাথে সন্ধি করা পছন্দ করে নি; কিন্তু তারা এক্ষেত্রে প্রভাবও বিস্তার করতে পারে নি। প্রভাবশালী দলটি ছিল হাসান রা.-এর এক বিশ্বস্ত। তাদের সংখ্যা ছিল লাখ-লাখ। হাসান রা, শুরুতেই নিজের এজেন্ডা প্রকাশ করেন নি; যাতে কোনো বিরোধীকণ্ঠ উচ্চকিত না হয়; বরং বাইয়াত গ্রহণের সময় তিনি শর্তারোপ করেছেন। তোমরা আমার কথা শুনবে এবং মানবে। আমি যার সাথে সন্ধি করবো তোমরাও তার সাথে সন্ধি করবে। যার

বিরুদ্ধে লড়াই করবো তোমরাও তার বিরুদ্ধে লড়াই করবে।ইরাকি সেনাদের যে দলটি শামের সাথে সন্ধিতে অনিচ্ছুক ছিল বাইআতের এসব শব্দে তারা বেশ হতাশ হয়েছিল। তারা বলাবলি করতে থাকে হাসান আমাদের মতের মানুষ নন।তিনি তো যুদ্ধই চান না।

হাসান রা.-এর আইনানুবর্তিতা ও ইবনু মুলজামের হত্যা

আলি রা.-এর হত্যাকারী আবদুর রহমান ইবনু মুলজামকে বিচারের জন্য উপস্থিত করা হয়। সে হাসান রা. কে বলে, 'আপনি কি একটি প্রস্তাব ভেবে দেখবেন? আল্লাহর কসম, আমি যখনই কোনো ওয়াদা করেছি, পুরা করেছি। আমি হাতিমে কাবাতে আল্লাহ তাআলার সাথে ওয়াদা করেছিলাম-আলি ও মুআবিয়াকে হত্যা করবো অথবা নিজে নিহত হবো। আপনার অমত না থাকলে আমাকে সুযোগ দেন, আমি মুআবিয়ার সাথে বোঝাপড়া করে আসি। যদি বেঁচে যাই নিজে এসে আপনার হাতে ধরা দেবো। হাসান রা. তার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন এবং তার মৃত্যুদণ্ডের ঘোষণা করেন। সেমতে তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়। সন্ধির ঘোষণা ও ষড়যন্ত্রকারীদের বিরোধিতা ইত্যবসরে মুআবিয়া রা. চিঠি পাঠিয়ে হাসান রা.-কে দাওয়াত দেন, 'আপনি আমার হাতে বাইআত হয়ে যান এবং যা ইচ্ছে দাবি করেন। হাসান রা. প্রস্তাবে সম্মত হন এবং চাচাত ভাই আবদুল্লাহ ইবনু জাফর রা.-কে বলেন,আমি একটা বিষয় ভেবেছি এবং আমি চাই আপনি এক্ষেত্রে আমাকে সঙ্গ দেবেন। আবদুল্লাহ ইবনু জাফর জিজ্ঞেস করেন, বলেন, কী ভেবেছেন?' উত্তরে হাসান রা. বলেন, 'আমি মদিনা ফিরে যাবো এবং রাষ্ট্রপরিচালনার দায়িত্ব মুআবিয়া রা.-এর হাতে সঁপে দেবো। অনেকদিন ধরেই তো এই বিবাদ চলছে। রক্তও ঝরেছে ঢের।' আবদুল্লাহ ইবনু জাফর পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে বলেন, 'পুরো মুসলিম উম্মাহর পক্ষ থেকে আল্লাহ তাআলা আপনাকে উত্তম বদলা দান করুক।' অতঃপর হাসান রা. সহোদর হুসাইন রা.-কে ডেকে নিজের সিদ্ধান্তের কথা জানান। শুরুতে তিনি কিছুটা দ্বিমত করলেও হাসান রা. তাকে বোঝান এবং বিভিন্ন যুক্তি-প্রমাণের আলোকে তাকে সম্মত করেন। হুসাইন রা. সন্তুষ্টচিত্তে সায় দেন। ইরাকি জনতার সম্মুখে ভাষণ ও ষড়যন্ত্রকারীদের ঔদ্ধত্য সমগ্র ইরাকবাসীকে মুআবিয়া রা.-এর বাইআতগ্রহণে সম্মত করার লক্ষ্যে হাসান রা. কিছুদিন পর সাবাত নামক স্থানে সবাইকে একত্র করেন। জনসমাবেশে তিনি ভাষণ দেন। অত্যন্ত দরদি ভাষায় তিনি বলেন- 'আমি নিজের জন্য যতখানি কল্যাণ কামনা করি, তোমাদের জন্যও ততখানি করি। আমি একটি সিদ্ধান্ত নিয়েছি। তোমরা আমার সিদ্ধান্ত প্রত্যাখ্যান করো না। নিঃসন্দেহে উম্মাহর বিচ্ছিন্নতার চেয়ে ঐক্য অনেক বেশি উত্তম।' অতঃপর বলেন, পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত আমি ও আমার ভাই ছাড়া আর কেউ নবীজির নাতি নয়। তারপরও আমি চাই, তোমরা মুআবিয়ার ব্যাপারে একমত হয়ে যাও। এটুকু বলতেই

সমাবেশে উপস্থিত খারিজি ও সাবায়ি মানসিকতার লোকগুলো উত্তেজিত হয়ে ওঠে এবং মন্তব্য করে, 'হাসানও তারা বাবার মতো কাফির হয়ে গেল। তাদের কয়েকজন হাসান রা.-এর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। কেউ কাঁধ থেকে চাদর খুলে নেয়। কেউ পায়ের নিচ থেকে জায়নামাজ টেনে বের করে নেয়। কয়েকজন গিয়ে হামলা করে তার তাঁবুর ওপর। লুট করে যা ছিল সব। এমনকি হাসান রা.-এর পায়ের তলা থেকে কার্পেট পর্যন্ত বের করে নিয়ে যায়।

মরণ-হামলা কয়েকদিন পর হাসান রা. মাদায়েনে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে এক স্থানে নামাজ পড়াচ্ছিলেন। ওইসব ষড়যন্ত্রকারীদের একজন খঞ্জর দিয়ে আক্রমণ করে। আকস্মিক আক্রমণে উরুতে যখম হয়ে যায়। সাথিরা হামলাকারীকে ধরে তৎক্ষণাৎ হত্যা করে। তিনি মাদায়েনের 'কসরে আবয়াজে' অবস্থান নেন। ক্ষতস্থানের চিকিৎসা হয় এবং তিনি আরোগ্য লাভ করেন। এই জালিমের দল তার দিকে হাত প্রসারিত করার সুযোগ পেয়েছিল কারণ, বাবার মতো তিনিও কোনোরকম প্রহরার ব্যবস্থা করেন নি। এমন নয় যে তার নিষ্ঠাবান সাথিরা, যাদের সংখ্যা হাজার হাজার, তারা বিদ্রোহী হয়ে গেছে। বিশুদ্ধ বর্ণনা অনুযায়ী এসব মরণ-হামলা ও লুটতরাজের পরও শেষ পর্যন্ত তিনি একজন স্বাধীন ও শক্তিশালী খলিফা ছিলেন। বাহিনী কেন সাথে নিলেন? কয়েকদিন পর হাসান রা. এক শক্তিশালী বাহিনী নিয়ে ইরাক থেকে শামের অভিমুখে যাত্রা করেন। সাধারণের ধারণা ছিল-বাহিনী নিয়ে তিনি শামের ওপর হামলা করতে যাচ্ছেন; কিন্তু হাসান রা.-এর উদ্দেশ্য ছিল, যে সকল প্রজা তার হাতে সন্ধি ও যুদ্ধের ব্যাপারে ওয়াদাবদ্ধ হয়েছিল তারা সবাই একত্র হোক। সবাইকে সাথে নিয়ে মুসলিমদের একটি বিরাট জনসমাবেশে মুআবিয়া রা.-এর হাতে খিলাফাতের দায়িত্ব তিনি অর্পণ করবেন। নিম্নোক্ত বর্ণনাসমষ্টি দ্বারা বিষয়টি প্রমাণিত হয়।১. ইমাম জুহরি রহ. থেকে বর্ণিত, হাসান রা. খলিফা হওয়ার পর থেকে যুদ্ধে আগ্রহী ছিলেন না। ২. হাসান রা. বাইআতের শুরুতেই শর্তারোপ করেছিলেন, 'আমি যার সাথে সন্ধি করবো তোমরাও তার সাথে সন্ধি করবে। এই শর্তকে বাইআতের শব্দে পরিণত করার কারণ, শুরু থেকেই তিনি সন্ধির প্রতি আগ্রহী ছিলেন। ৩. বাইআতের সময় কিছু কিছু সেনাপতি বলতে চেয়েছিলেন, 'আমরা আপনার হাতে কুরআন ও সুন্নাহর আনুগত্য ও বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার বাইআত করছি।' কিন্তু হাসান রা. তা বাতিল করে দিয়ে তাদের দিয়ে বলিয়ে নেন, 'কুরআন ও সুন্নাহর ওপর।' অতঃপর বলেন, কুরআন-সুন্নাহর অনুসরণে এ সমস্ত শর্ত রয়ে গেছে।' ৪. হাসান রা. কেবল এজন্য তার জনৈক সেনাপতিকে বরখাস্ত ছিলেন যে, সে শামে হামলা করার ব্যাপারে জিদ ধরে ছিল। তার পরিবর্তে তিনি উবাইদুল্লাহ ইবনু আব্বাসকে সেনাপতি নিযুক্ত করেন। ৫. এক বিরাট শক্তিশালী বাহিনী তার শাম যাত্রা এবং অকস্মাৎ সেখানে মুআবিয়া রা.-এর সাথে সন্ধি করে নেওয়া এই বাস্তবতাকে উন্মুক্ত করে যে, বাহিনী নিয়ে তার এই

যাত্রা যুদ্ধের লক্ষ্যে নয়। নতুবা এত বিরাট বাহিনী নিয়ে শামের ওপর আক্রমণ করতে তাকে কে বাধা দিত?

সহিহ বুখারির বর্ণনায় স্বয়ং হাসান রা.-এর বক্তব্য রয়েছে। মুসলিম উম্মাহকে আরও রক্তপাত থেকে বাঁচানোর তাগিদে তিনি এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন।

হাসান ও হুসাইন রা.-এর ইরাক ত্যাগ ও শেষ সংলাপ

খিলাফাতের দায়িত্ব থেকে সরে আসার পর হাসান রা. মাদায়েনের দুর্গে জনতাকে একত্র করেন। তাদের উদ্দেশ্যে বলেন-'ইরাকবাসী, বাইআতের সময় তোমরা আমাকে কথা দিয়েছিলে, সন্ধি ও যুদ্ধে তোমরা আমার সঙ্গ দেবে। আমি মুআবিয়া রা.-এর হাতে বাইআত হয়েছি। তোমরা তার কথা মেনে চলো।' অতঃপর হাসান রা. কুফায় আগমন করেন। সেখানে শহরবাসীর উদ্দেশ্যে একটি প্রভাব সৃষ্টিকারী বক্তৃতা দেন। বক্তৃতায় তিনি প্রতিবেশী, মেহমান ও বনু হাশিমের হকসমূহের প্রতি খেয়াল রাখার তাগিদ দেন। ইরাকের ফিতনাবাজদের দ্বারা নবীপরিবারের সদস্যরা অনেক কষ্ট পেয়েছেন। কিন্তু যাত্রার প্রাক্কালে তিনি মহানুভবতার প্রকৃষ্ট উদাহরণ পেশ করে তাদের সকল জুলুম-নির্যাতনকে ক্ষমা করে দেন এবং বলেন, 'ইরাকবাসী, আমি তোমাদের তিনটি জিনিসই ক্ষমা করে দিলাম: আমার বাবার হত্যা, আমার ওপর বর্শার আঘাত এবং আমার সম্পদ লুটপাট।' হাসান রা.-এর এমন বক্তব্য শুনেও অনেকের চিত্তদহন ঠান্ডা হয় নি। মুআবিয়া রা.-এর সাথে সন্ধি করার কারণে তারা তাকে অপমান করতে থাকে। তারা বলতে থাকে, 'আপনি মুমিনদের জন্য অপমানের কারণ।তিনি তৎক্ষণাৎ উত্তর দেন, 'অপমান ভালো নাকি জাহান্নাম। মুআবিয়া রা.-এর সদাচরণ মুআবিয়া রা. আমৃত্যু হাসানাইনের (হাসান ও হুসাইন রা.) খিদমাত ও ইজ্জত করে গেছেন। একবার হাসান ও হুসাইন রা. তার দরবারে উপস্থিত হলে তিনি বলেন, 'আমি আপনাদের এমন উপঢৌকন দেবো, ইতোপূর্বে যা কেউ কাউকে দেয় নি। অতঃপর তিনি তাদের দুই লাখ দিরহাম দেন। একবার মুআবিয়া রা. তাদের এবং তাদের ভাই আবদুল্লাহ ইবনু জাফর রা.-এর জন্য এক লাখ দিরহাম পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। উপহার পাঠানোর এই ধারা শেষ পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। হাসান ও হুসাইন রা.-ও মুআবিয়া রা.-এর হাদিয়া কবুল করে গেছেন।

হাসান রা.-এর মৃত্যু

বাকি জীবন তিনি মদিনায় কাটান। ৪৯ বা ৫০ হিজরিতে যখন তার বয়স ৫৭ বছর, কেউ একজন অত্যন্ত গোপনে তাকে বিষ পান করিয়েছিল। বিষের প্রভাবে কয়েকদিন পর তিনি ইনতিকাল করেন। হুসাইন রা. জানাজার নামাজ পড়ানোর জন্য সায়িদ ইবনুল আস রাঃকে এগিয়ে দেন। সায়িদ ছিলেন বনু উমাইয়ার স্বনামধন্য ব্যক্তি। হাসান রাঃকে জান্নাতুল বাকিতে তার সম্মানিতা মা সায়্যিদা ফাতিমা রাঃএর পাশে দাফন করা হয়। আবু হুরাইরা রা. মসজিদে নববিতে সমবেত জনতাকে উদ্দেশ্য করে বলেন, 'লোকসকল, আজ নবীজির প্রিয় ব্যক্তি দুনিয়া ছেড়ে চলে গেলেন। আবু হুরাইরা রা.-এর কথা শুনে একজন মানুষও চোখের পানি ধরে রাখতে পারে নি। যদিও তার খিলাফাতকাল ছিল অতি সংক্ষিপ্ত।কিন্তু উম্মাহর ওপর তার অনুগ্রহ সর্বদা টিকে থাকবে। তিনি অতুলনীয় মহানুভবতা ও অসাধারণ হিকমত- কৌশলের প্রকাশ ঘটিয়ে উম্মাহকে ঐক্যের পথে নিয়ে এসেছিলেন। তিনি এমন আত্মোৎসর্গের দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছেন-মুসলিমদের ইতিহাস যা নিয়ে গর্ব করবে। তিনি ছিলেন রাসুলের বংশধর। ছিলেন খিলাফাতের সর্বোচ্চ মর্যাদায় সমাসীন। ইরাকি বাহিনী তার ইশারায় মৃত্যুমুখে ঝাঁপিয়ে পড়তে তৈরি ছিল। তার জনপ্রিয়তা ও গ্রহণযোগ্যতা ছিল সর্বজনস্বীকৃত। এতসব থাকার পরও তিনি আনুগত্য কবুল করেছেন। তার জায়গাতে পৃথিবীর যেকোনো শাসক হতো, নেতৃত্বের জন্য জীবন দিয়ে দিত। কিন্তু তিনি তো কোনো বাদশা ছিলেন না, ছিলেন খুলাফায়ে রাশিদিনের পরিশিষ্ট। নেতৃত্ব, স্বার্থপরতা, ব্যক্তিগত কল্যাণচিন্তা, কামনা-বাসনা থেকে যারা ছিলেন পূত-পবিত্র, হাসান রা. ছিলেন তাদেরই প্রতিচ্ছবি। যে অনুপম আত্মোৎসর্গের দৃষ্টান্ত তিনি রেখে গেছেন- তা কেবল একজন প্রকৃত খলিফায়ে রাশিদের পক্ষে সম্ভব। বিভেদ-বিচ্ছিন্নতার সময় মুসলিমদের যুথবদ্ধ করা এবং ফিতনাবাজদের হাত থেকে নিজেকে বাঁচাতে তিনি যা করেছেন কিয়ামত পর্যন্ত তা মুসলিমদের জন্য উত্তম আদর্শ হিসেবে টিকে থাকবে, পথ দেখাবে।

মুয়াবিয়া বিন আবু সুফিয়ান রাঃ এর খিলাফতকাল ও তাঁর শাসনব্যবস্থা

হজরত মুয়াবিয়া রাঃ প্রসিদ্ধ মতানুসারে নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়তপ্রাপ্তির পাঁচ বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন। রাসূল (সা) এর চাইতে তিনি অনেক ছোট ছিলেন। তার উপনাম আবু আবদুর রহমান।

তিনি ছিলেন প্রথম উমাইয়া খলিফা এবং তিনি ছিলেন উমাইয়া বংশীয়। উমাইয়া ইবনে আবদে শামস নামক ব্যক্তির নামানুসারে তাঁর বংশধারার নাম হয় উমাইয়া। তিনি ছিলেন অত্যন্ত বদান্য ও দানশীল ব্যক্তি। তাঁর সাথে উমাইয়া বিন আবদে শামস নামে একজন ধনী ব্যক্তি দান-খয়রাতের ব্যাপারে প্রতিযোগিতা করত। তিনি যদিও হাশেম এর চেয়ে বেশি ধন-সম্পদ খরচ করত কিন্তু হাশেমের মতো বিখ্যাত হতে পারেনি যার ফলে হাশেমের সাথে তার শত্রুতা শুরু হয়ে যায় যার ফলশ্রুতিতে পরবর্তীতে তাঁর বংশধারার মধ্যেও এই শত্রুতা বজায় থাকে। হাশেমের বংশ থেকেই

বনু হাশেম বা বনু আব্বাস এর উৎপত্তি। এখান থেকেই বনু হাশেম বা বনু আব্বাস এবং উমাইয়ার মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে গেলো।পরবর্তীতে ষাট সত্তর বছর পরেও এই আব্বাসীয় এবং উমাইয়াদের যে দ্বন্দ্ব তা চলতে থাকে যা বনু হাশেম এবং উমাইয়া বিন আবদে শামস এর সময় থেকে শুরু হয়। উমাইয়া ইবনে আবদে শামস এর সময় থেকেই তার বংশের নাম হয়েছিল উমাইয়া বংশ এবং উসমান (রা) তিনিও ছিলেন উমাইয়া বংশের খলিফা। কিন্তু আনুষ্ঠানিকভাবে শাসন ক্ষমতা উমাইয়া বংশ লাভ করে মুয়াবিয়া (রা) এর মাধ্যমে। এই কারণে তাকে প্রথম উমাইয়া খলিফা বলা হয়। আর প্রথম উমাইয়া বংশীয় খলিফা বলা হয় সেটা উসমান (রা) কে। মুয়াবিয়া (রা) এর খিলাফতকাল ছিল ৪১ হিজরি রবিউল আউয়াল-৬০ হিজরি রজব পর্যন্ত। অর্থাৎ জুলাই ৬৬১ খ্রিষ্টাব্দ-এপ্রিল ৬৮০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত।

দায়িত্ব-লাভের পর বিশিষ্ট সাহাবিদের সামনে সাইয়িদুনা মুআবিয়া রাঃ ঐতিহাসিক ভাষণ দেন। সহিহ বুখারির বর্ণনায় আছে আবদুল্লাহ ইবন উমার রা. একবার হাবিব ইবনু মাসলামা রা.-কে এই ভাষণের স্বচক্ষে দেখা বিবরণ এভাবে শুনিয়েছিলেন: 'লোকজন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে মুআবিয়া রা. ভাষণ দেওয়ার জন্য দাড়ান। ভাষণে তিনি বলেন- কারও ব্যাপারে কিছু বলার থাকলে মাথা উঁচু করে বলুক। খিলাফাতের ব্যাপারে আমি তার ও তার পিতার চেয়ে অধিক হকদার বর্ণনাকারী হাবিব ইবনু মাসলামা বলেন, আমি (ইবনু উমারকে) জিজ্ঞেস করি, আপনি কি তার কথার উত্তর দিয়েছিলেন? তিনি বলেন, আমি আমার জায়গাতে থেকে ওঠার চেষ্টা করেছিলাম। আমি তাকে বলতে চাইছিলাম, আমি বলতে গিয়েও থেমে গেছি; যাতে সমাবেশে হাঙ্গামা সৃষ্টি না হয় এবং নতুন করে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে না যায়। যাতে আমার কথার কেউ ভিন্ন অর্থ করতে না পারে। ফলে কেবল জান্নাতের সাওয়াব লাভের আশা করেছি। হাবিব ইবনু মাসলামা বলেন, 'আপনি বেঁচে গেছেন। খিলাফাতের দায়িত্ব অর্পণ করার সময় অবশ্যই হাসান রা. বুঝে নিয়েছেন যে তার মধ্যে নেতৃত্ব ও রাজনীতির যোগ্যতা আছে এবং তিনি ন্যায়পরায়ণ, তাকওয়াবান। মুয়াবিয়া রা.-এর বৈশিষ্ট্য না আলী রা. আর না হাসান রা.

অস্বীকার করেছেন। হ্যাঁ, খুলাফায়ে বিবেচনার তার যা কমতি ছিল সেটাও অস্বীকার করা সম্ভব।

মুআবিয়া রা. নিজেকে আলি রা., হাসান-হুসাইন রা. ও আবদুল্লাহ ইবনু উমার রা. থেকে উত্তম মনে করতেন না। কিন্তু তার ধারণা ছিল, রাষ্ট্র পরিচালনা আমি তাদের তুলনায় ভালো করতে পারি। এজন্যই তিনি দৌড়ঝাঁপ করছিলেন। আপন প্রয়াসে তিনি ছিলেন সৎ। এবং পরবর্তী ইতিহাস প্রমাণ করে, তিনি অত্যন্ত যোগ্য ও ন্যায়পরায়ণ শাসক ছিলেন। উদ্দেশ্য হলো, আমি ওইসব অগ্রজ মুহাজিরদের একজন যারা বদর, উহুদ, খন্দকে তোমার পিতা আবু সুফিয়ানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। তখন পর্যন্ত তোমরা মুসলিম হও নি। পূর্ববর্তী খিলাফাতগুলোতে 'ইসলামগ্রহণে অগ্রগামিতা', হিজরত, জিহাদ ও অন্যান্য কুরবানি যোগ্যতার মাপকাঠি ছিল। এদিক থেকে আমি তোমার তুলনায় অধিক যোগ্য। কিছু কিছু ইতিহাসবিদ ও হাদিসের ব্যাখ্যাকার ভুল বুঝেছেন। তারা মনে করেন, ইয়াজিদকে ওলি আহদ (হবু খলিফা) নির্বাচনের সময় মুআবিয়া রা. মদিনা মুনাওয়ারায় এই ভাষণ দিয়েছিলেন। কিন্তু এটা কেবলই ধারণা। বর্ণনাটির কোনো জায়গাতে মদিনা বা ইয়াজিদের উল্লেখ নেই।

হজরত মুয়াবিয়া রাযিঃ এর কিছু গুণ-বৈশিষ্ট্যঃ মুয়াবিয়া (রা) এর একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তিনি তাঁর জীবনের ৪০ বছর রাজনীতির মধ্যে কাটিয়েছেন ২০ বছর তিনি শামের গভর্নর ছিলেন। উমর (রা) এর সময় নিয়োগ পেয়েছিলেন এরপর উসমান (রা) আলী (রা) এর সময় ছিলেন। পরবর্তীতে হাসান (রা) এর সময় তিনি সমঝোতার মাধ্যমে খেলাফত নিয়ে নিলেন। তিনি ২০ বছর খলিফা ছিলেন এবং অত্যন্ত সতর্কতা ও বিচক্ষণতার সাথে তিনি খোলাফায়ে রাশেদার সময়কার যে শান্তি শৃঙ্খলা আরও নির্দিষ্ট করে বলতে গেলে আবু বকর (রা) ও উমর (রা) এর সময়ের মতো শৃঙ্খলা, শাসন ও ন্যায়পরায়ণতা তিনি সমাজের মধ্যে ফিরিয়ে এনেছিলেন এবং এই পুরোটা সময় কেউ তাঁর বিদ্রোহ করার সাহস কিংবা সুযোগ পায়নি বরং যারা তাঁর বিরোধী ছিল তারা পর্যন্ত মুয়াবিয়া (রা) এর খেলাফত মেনে নিতে এবং তাঁর হাতে খেলাফতের বায়'আত করতে বাধ্য হয়েছিল। এমন একজন অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্ব, বিজ্ঞ প্রাজ্ঞ রাজনীতিবিদ তিনি ছিলেন এবং তিনি বুঝতেন কখন কোথায় কোন পদক্ষেপ নিতে হবে এবং যার সাথে যে ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি তার সাথে সে ধরনের পদক্ষেপ নিতেন। যে সকল এলাকার মানুষ বেশি খারাপ সে সকল এলাকায় এমন গভর্নর পাঠাতেন যাকে মানুষ জমের মত ভয় করতো। এত কঠোর গভর্নর তিনি নিয়োগ দিতেন। ইরাকের লোকজন ছিল প্রচণ্ড রকম বিশ্বাসঘাতক। এইজন্য তিনি ইরাকে গভর্নর নিয়োগে সবচেয়ে কঠিন ও পাষাণ হৃদয়ের মানুষগুলোকে ইরাকে নিয়োগ দিতেন। যখনই দেখা যেত

বিদ্রোহীরা কোনো আপত্তি উত্থাপন করছে, কিংবা বিদ্রোহ করার মতো অবস্থা তিনি আগে খোঁজ নিতেন তারা কি চায়! যখন বলতো তারা টাকা-পয়াসা চায় বা অন্যকিছু চায় তাহলে তিনি এত বিপুল পরিমাণ টাকা-পয়সা দিতো যে তারা এর লোভে বিদ্রোহ বন্ধ করে দিতো। আবার যদি দেখতেন কেউ যুদ্ধ করতে চায় তার বিপরীতে তিনি বিশাল সৈন্যবাহিনী পাঠিয়ে দিতেন এবং এই সৈন্যবাহিনী দিয়েই তাকে দমন করতেন। তিনি অত্যন্ত বিচক্ষণ এবং প্রতাপশালী রাজনীতিবিদ ছিলেন। রাসূল (সা)- এর পরে সাহাবিদের মধ্য থেকে মুসলিম উম্মাহর সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদ যদি বলা হয় তাহলে তাঁর নাম নিঃসন্দেহে সবার শীর্ষে থাকবে। হজরত মুয়াবিয়া (রা) ইসলাম গ্রহণ করেন মক্কা বিজয়ের বছর। তাঁর পিতা আবু সুফিয়ান (রা) ও মাতা হিন্দা রাযি. তাঁর পরে ইসলাম গ্রহণ করেন। মুয়াবিয়া (রা), মুসলিম অবস্থায় নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সংস্পর্শ খুব কম লাভ করেছেন। দুই-এক বছর পেয়েছিলেন। এ সময়টা তিনি নবীজির নির্দেশে ওহি লিপিকারের দায়িত্ব পালন করেছেন। এটি একটি বিরাট সম্মান ও বটে। নবীজি (সা) হতে একশ তেষট্টিটি হাদিস তিনি বর্ণনা করেছেন। নবীজি একদিন মুয়াবিয়া রাঃ এর জন্য বিশেষভাবে দোয়া করে বলেনঃ "হে আল্লাহ, তাকে সত্যের পথপ্রদর্শক ও সুপথপ্রাপ্ত বানান এবং তাঁর মাধ্যমে অন্যদেরকেও হিদায়াত দান করুন ।১৯ হিজরি সনে তার ভাই ইয়াযিদ বিন আবু সুফিয়ানের মৃত্যু হলে শামের দায়িত্ব পালন করার সময় তখন তৎকালীন খলিফা উমর (রা) মুয়াবিয়া (রা) কে দামেশকের গভর্নরের দায়িত্ব প্রদান করেন। এরপর তিনি ২০ হিজরি ৪০ হিজরি টানা বিশ বছর পর্যন্ত সিরিয়ার গভর্নর ছিলেন। ৪১ হিজরিতে তিনি খলিফা হিসেবে বায়'আত নিলেন। তিনি যে একজন ভালো রাজনীতিবিদই ছিলেন শুধু তাই না তিনি একজন বড় ফকীহ ছিলেন। বিশুদ্ধ বর্ণনামতে হজরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা)এর মতো বড় বড় সাহাবীরাও তাঁর ফিকহি প্রজ্ঞার স্বীকৃতি দিয়েছেন। ইমাম বুখারি রহ. আপন সনদে হজরত ইবনে আবি মুলায়কা রাঃ হতে উল্লেখ করেছেন হজরত মুয়াবিয়া রাঃ এশার নামাজের পর এক রাকাত বিতির নামাজ আদায় করলেন। তখন সেখানে ইবনে আব্বাস রাযি.-এর জনৈক ক্রীতদাস উপস্থিত ছিল। সে ইবনে আব্বাস রাঃ কে বিষয়টি অবগত করলে ইবনে আব্বাস (রা) উত্তর দিলেন, তাকে কিছু বলো না। কেননা, তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের

সংস্পর্শ লাভ করেছেন। বুখারি শরিফের আরেক বর্ণনায় উল্লেখ আছে ইবনে আব্বাস রাঃ বলেন, 'কেননা, তিনি মুয়াবিয়া তো ফকিহ। এ থেকে বুঝা যায় তিনি দ্বীনের জ্ঞান গভীরভাবে রাখতেন। তিনি খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের পরপরই মুসলিম উম্মাহর পরিস্থিতি অনুকূল হতে শুরু করে। কেননা আলী (রা) এর সময়েও পরিস্থিতি মোটেও স্বাভাবিক ছিলোনা। একটা

গোলযোগপূর্ণ, বিদ্রোহপূর্ন পরিস্থিতি, সব মিলিয়ে খুব অস্থিতিশীল একটা পরিস্থিতি ছিলো। কিন্তু মুয়াবিয়া (রা) যখন থেকে ক্ষমতা নিলেন তখন এই অস্থিতিশীল অবস্থা কেটে যেতে লাগলো এবং পুনরায় শান্তি ও নিরাপত্তা ফিরে আসলো। একথা সত্য যে, মুয়াবিয়া (রা) যখন খলিফা হলেন তখন তাঁর চেয়ে মর্যাদাগত দিক থেকে অনেক উঁচু মর্যাদার সাহাবা ছিলেন যা তিনি নিজেও অস্বীকার করতেন না। যেমন, সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা), আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) এ ধরনের প্রাথমিক যুগের অনেক সাহাবী তখনও জীবিত ছিলেন। কিন্তু ইসলামে নেতৃত্ব শুধুমাত্র ঈমান-আমলের উপর নির্ভর করেনা। এটা একটা কারণ হতে পারে। এজন্য তিনি খলিফা হওয়ার পর যে ভাষণ দেন তাতে তিনি বলেন, "হে লোকসকল, আমি তোমাদের মাঝে সর্বশ্রেষ্ঠ নই। নিঃসন্দেহে অনেকেই আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। যেমন, আবদুল্লাহ বিন উমর, আবদুল্লাহ বিন আমর প্রমুখ। কিন্তু সম্ভবত নেতৃত্বদানে আমি তোমাদের মাঝে সবচেয়ে কল্যাণকর বিবেচিত হব এবং তোমাদের শত্রুদের চোখে আমি সবচেয়ে অনিষ্টকর বিবেচিত হব।" সত্যিকার অর্থেই তাঁর এই কথা পুরোপুরি ফলপ্রসূ ও সত্য হয়েছিলো। একদিকে যেমন মুয়াবিয়া রাঃ উন্নত চরিত্র, আখলাক এবং দ্বীনের জ্ঞান সবদিক দিয়েই তিনি উন্নত বৈশিষ্ট্যের অধিকারি ছিলেন ঠিক তেমনি ইসলামি রাষ্ট্রের সীমান্ত প্রহরা ও সীমানা রক্ষায় তাঁর প্রশংসনীয় ভূমিকা, সেনাবাহিনীর শৃঙ্খলা রক্ষা ও শত্রুর মোকাবিলায় তার সবিশেষ দক্ষতা এবং প্রজ্ঞাপূর্ণ প্রশাসন ও রাজনীতির জ্ঞান খলিফা মুয়াবিয়া (রা) কে এক বিশেষ মর্যাদা এবং সম্মানের আসনে দাখিল করেছে। অনেকেই মুয়াবিয়া (রা) এর ব্যাপারে বুঝের ভুলের কারণে মনে কিছুটা বিরূপ ধারণা চলে আসে। এর পিছনে মূল যে বিষয়টি কাজ করে সেটি হল তিনি আবু সুফিয়ানের ছেলে। কিন্তু আবু সুফিয়ান (রা) নিজেও একজন সাহাবী ছিলেন এবং তিনি শাহাদাতবরণ করেছেন। আল্লাহ সুবহানাহুওয়া তা'য়ালা তাকে শাহাদাতের মর্যাদা মক্কা বিজয়ের সময় ইসলাম গ্রহণ করেছেন। ইসলামগ্রহণের প্রাথমিক অবস্থায় যদিও তিনি একজন একনিষ্ঠ মুসলিম ছিলেন না। তাঁর জাহেলি সমাজ বা গোত্রের প্রতি ভালোবাসা তখনও যায়নি। এসব কারণে আবু সুফিয়ান (রা) কে নিয়ে অনেকেই বিরূপ ধারণা রাখে। তিনি যখন সাহাবী হয়েছেন এবং তাঁর পরিবার সমেত ইসলাম গ্রহণ করেছেন তখন তাঁর মর্যাদা বা সম্মান নিয়ে প্রশ্ন তোলার কোনো অবকাশ নেই। এইজন্য মুয়াবিয়া (রা) এর ব্যাপারে ও তাই প্রযোজ্য। ইসলামি শরিয়ায় একজনের দায়ভার আরেকজনের উপর বর্তায় না সুতরাং তাঁর বাবা কি করেছে তার দায়ভার তার ওপর আসবেনা। এছাড়া তার বাবাও একজন সাহাবী ছিলেন যিনি আল্লাহর রাস্তায় জীবন দিয়ে শহীদ হয়ে গেছেন এজন্য আমাদেরকে বিরূপ ধারণা করা থেকে বের হয়ে আসতে হবে। সাহাবীদের এই অন্তর্বিরোধ নিয়ে লেখালেখি করতে গিয়ে বেশকিছু সমসাময়িক লেখক অনেক ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় আদব রক্ষা করতে পারেনা এটাও একটি মূল কারণ আমাদের মনে তাদের সম্পর্কে একটি বিরূপ ধারণা সৃষ্টি হওয়ার জন্য। ইমাম ইবনে

তাইমিয়া রহ. মিনহাজুস সুন্নাহ গ্রন্থে লিখেছেন ইসলামি ইতিহাসে (খোলাফায়ে রাশিদিন-পরবর্তী যুগে) হজরত মুয়াবিয়া রাযি.-এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ কোনো শাসক নেই। প্রজাদের সাথে মুয়াবিয়া (রা)-এ সঙ্গে তাঁর আচরণ ছিল শাসকের সদাচরণের শ্রেষ্ঠতম উদাহরণ। জনগণও তাকে ভালোবাসত। আর নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "তোমাদের সর্বোত্তম নেতা ও শাসক তারা, যাদেরকে তোমরা ভালোবাসো, আর তারাও তোমাদেরকে ভালোবাসে। তারা তোমাদের জন্য

দোয়া করে, তোমরাও তাদের জন্য দোয়া করো। আর তোমাদের নিকৃষ্ট নেতা হচ্ছে তারা, যাদেরকে তোমরা ঘৃণা করো, তারাও তোমাদেরকে ঘৃণা করে। তোমরা তাদেরকে অভিশাপ দাও আর তারাও তোমাদেরকে অভিসম্পাত করে। এই হাদীস থেকেও বোঝা যায় রাসূলুল্লাহ (সা) এর বর্ণনা অনুযায়ীও মুয়াবিয়া (রা) ছিলেন সর্বোত্তম নেতা এবং শাসক। এছাড়া ঐতিহাসিক ইবনে খালদুন রহ. তারিখে ইবনে খালদুন' গ্রন্থে লিখেছেন হজরত মুয়াবিয়া রাঃ এর শাসনব্যবস্থা ও ইতিহাসকে খোলাফায়ে রাশিদিনের রাষ্ট্রব্যবস্থা ও ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত করা উচিত। কেননা, কর্ম ও কীর্তি, ইনসাফ ও ন্যায়পরায়ণতা এবং নবীসংস্পর্শের ক্ষেত্রে তিনি খোলাফায়ে রাশিদিনেরই স্বার্থক অনুগামী ছিলেন। সমাজে পুনরায় শান্তি শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠাঃ মুয়াবিয়া (রা) এর সময় শুধু যে অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা, নিরাপত্তা বজায় ছিল বা রক্ষিত হয়েছিল তাই নয় বরং তাঁর সময় ইসলামী সাম্রাজ্যের মানচিত্র বিস্তৃত হয়। দূর-দূরান্তের অঞ্চলে তিনি অভিযান পরিচালনা করতেন এবং অত্যন্ত সফলতার সাথে ইসলামী সাম্রাজ্যের সীমানা বিস্তৃত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ইরাকের অধিবাসীগণ বারবার বিদ্রোহ-বিশৃঙ্খলা ও ফিতনা সৃষ্টি করে সমকালীন মুসলিম উম্মাহর ঐক্য ও সম্প্রীতি বিনষ্ট করছিল। এ কারণেই খলিফা হওয়ার পর তিনি হজরত মুগিরা বিন শুবা (রা) কে ইরাক অঞ্চলের গভর্নর নিযুক্ত করলেন। কেননা তিনি পরিস্থিতির দাবি অনুযায়ী আপন প্রজ্ঞা ও কৌশলের পাশাপাশি বিচক্ষণতা ও কঠোরতা ব্যবহার করেন এবং ইরাকবাসীকে সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হন। ৪৯ হিজরিতে তিনি মারা গেলে তাঁর মৃত্যুর পর খলিফা মুয়াবিয়া (রা) ৫০ হিজরি সনে যিয়াদ বিন আবু সুফিয়ানকে ইরাকের গভর্নর নিযুক্ত করেন।

মুয়াবিয়া রাযি. এর উল্লেখযোগ্য কিছু কৃতিত্বঃ মুয়াবিয়া (রা) এর আরেকটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা হলো, ইসলামী সাম্রাজ্যের সীমানা বিস্তারের জন্য তিনি সেনাবাহিনী ও নৌ-বাহিনী পাঠিয়েছিলেন। সেই সময় আগে থেকেই মুসলিমদের নৌবাহিনী ছিল। অনেক দূরের পথ, ভিন্ন মহাদেশে সমুদ্র পাড়ি দিয়ে যেতে হবে এই সব জায়গায় তিনি সীমানা বিস্তারিত করেছেন বলতে শুধু বর্ডার বিস্তৃত করেছেন তাই নয় সমুদ্র পাড়ি দিয়ে তাঁর নৌবাহিনীর মাধ্যমে দূর-

দূরান্তের বিভিন্ন এলাকা তিনি জয় করেছিলেন। মুয়াবিয়া রা.-এর আমলে মুসলিম নৌবহরের রণতরীর সংখ্যা সতেরোশ-তে পৌঁছেছিল। প্রতিটি যুদ্ধজাহাজ ছিল পর্যাপ্ত সৈন্য ও যুদ্ধাস্তরে সমৃদ্ধ। তিনি প্রথমে আক্কায় একটি শিপইয়ার্ড নির্মাণ করেন, এরপর ৫৪ হিজরি সনে দ্বিতীয়বারের মতো মিশরের রওজা দ্বীপে আরেকটি শিপইয়ার্ড নির্মাণ করেন। শিপইয়ার্ড নির্মাণের কিতৃত্ব এককভাবেই তাঁর এবং তিনিই প্রথম শিপইয়ার্ড নির্মান করেন। মুয়াবিয়া রাযি.-এর শাসনামলে দু দুবার স্থল ও নৌবাহিনীর সমন্বয়ে কনস্টান্টিনোপল বিজয়ের প্রচেষ্টা চালানো হয়। অবশ্য দু-বারই মুসলিম অভিযাত্রীদল কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হয়। এসব অভিযানে প্রবীণ সাহাবিগণসহ বিশিষ্ট সাহাবিদের অনেকেই অংশগ্রহণ করেন। পরবর্তীতে সুলতান মুহাম্মদ আল ফাতিহ এর মাধ্যমে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা কনস্টান্টিনোপলকে মুসলমানদের অধিনে এনে দেন। মুয়াবিয়া (রা) যে তাঁর নৌবাহিনীর মাধ্যমে কন্সটান্টিনোপল আক্রমণ করবেন এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সা) একটি ভবিষ্যৎবাণী করে গিয়েছিলেন। তিনি ইরশাদ করেন- "আমার উম্মতের প্রথম যে দলটি নৌযুদ্ধে অংশগ্রহণ করবে, তারা যেন জান্নাত অনিবার্য করে ফেলল। আমার উম্মতের প্রথম যে দলটি (রোমান সম্রাট) কায়সারের নগরী আক্রমণ করবে, তারা ক্ষমাপ্রাপ্ত হবে।" হাদিসে কায়সারের নগরী দ্বারা বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের রাজধানী কনস্টান্টিনোপল

উদ্দেশ্য। এই হাদিস থেকে দেখা যায় মুয়াবিয়া (রা) ও তার বাহিনী কনস্টান্টিনোপল যুদ্ধ করার মাধ্যমে দুইটা ফজিলত লাভকরেছেন। 1. তারা নিজেদের জন্য জান্নাতকে ওয়াজিব করে নিয়েছেন। 2. তারা নিজেদের জন্য আল্লাহর ক্ষমা কে ওয়াজিব করে নিয়েছেন। এই হাদিসটা থেকেও মুয়াবিয়া (রা) এর সম্মান ও বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কথা প্রমাণিত হয়। সামাজিক উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডঃ মুয়াবিয়া রাযি. প্রথমবারের মতো ইসলামি রাষ্ট্রে ডাকব্যবস্থাও চালু করেছিলেন। ডাকব্যবস্থাকে কার্যকর ও গতিশীল করে তুলতে সুদীর্ঘ পথের নির্দিষ্ট দূরত্ব পর পর একটি মনজিল নির্ধারণ করা হয়েছিল। খলিফার বার্তা বিভিন্ন নগরীতে পৌঁছানোর জন্য প্রতিটি মনজিলে বাহনজন্ত প্রস্তুত থাকত। রাজধানী হতে কোনো বার্তা প্রেরণ করা হলে ডাকবিভাগের প্রধান দ্রুত তা প্রথম মনজিলে পৌঁছিয়ে দিতেন। মনজিলের দায়িত্বশীল দ্রুত তা পৌঁছিয়ে দিতেন পরবর্তী মনজিলে। এভাবে সম্ভাব্য স্বল্পতম সময়ে বার্তাটি পৌঁছে যেত কাঙ্ক্ষিত গভর্নর বা কর্মকর্তার কাছে। তাঁর শাসনামলে শামের দাপ্তরিক কার্যক্রম রোমোন ভাষায় পরিচালিত হতো, তাই রোমান ভাষায় পারদর্শী সারজুনকেই এ পদে নিয়োগ দেওয়া হয়। রোমান ভাষা ছিল খ্রিস্টানদের ভাষা কিন্তু তিনি এখানে এমন মনোভাব রাখেননি যে, আমরা একদিকে খ্রিস্টানদের সাথে যুদ্ধ করছি আরেকদিকে তাদের ভাষা কেনো গ্রহণ করবো! এটা কাফেরদের ভাষা তাই গ্রহণ করা যাবেনা এমন কোন মনোভাব ছিলোনা। বরং প্রতিটি

ভাষাই হচ্ছে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা পক্ষ থেকে নেয়ামত। তাই এই নেয়ামতের কদর করতে হবে সেটা যে কোনো ভাষাই হোক। তবে কুরআন ও হাদিসের ভাষা হিসেবে আরবির যে মর্যাদা সেটা ভিন্ন বিষয়। এজনাই সিরিয়ার রাষ্ট্রীয় পদগুলোতে তিনি তাদেরকে নিয়োগ দিয়েছিলেন যারা রোমান ভাষায় পারদর্শী ছিলো। এভাবেই কেটে যায় মুয়াবিয়ার রা-এর খিলাফত আমলের প্রায় বিশ বছর। একসময় মুয়াবিয়া (রা) অনুভব করেন যে, তার বিদায়ের সময় ঘনিয়ে এসেছে। দীর্ঘ কর্মপ্রচেষ্টার মাধ্যমে তিনি পুরো ইসলামি বিশ্বকে বিদ্রোহ-বিশৃঙ্খলামুক্ত একক শক্তিশালী সাম্রাজ্যে পরিণত করতে সক্ষম হয়েছেন। মুয়াবিয়া রা উপলব্ধি করেন যে, তিনি যদি পরবর্তী খলিফা নির্ধারণের বিষয়টি সমাধান করে না যান, তাহলে মুসলিম উম্মাহ আবারও এক দীর্ঘমেয়াদি ফিতনায় জড়িয়ে যেতে পারে। পরবর্তী খলিফারূপে ইয়াজিদের মনোনয়ন প্রতিটি দূরদর্শী শাসকের মতো মুআবিয়া রা.-ও চাইতেন, রাষ্ট্র অভ্যন্তর ও বহির্দেশে সুসংহত ও সুদৃঢ় হবে। এ জন্য তিনি রাষ্ট্রব্যবস্থাপনায় এমন পরিবর্তন আনা জরুরি ভাবলেন, যার দ্বারা গৃহযুদ্ধের আশঙ্কা শেষ হয়ে যাবে। এ জন্য তিনি আরব-নেতৃবৃন্দকে সংগঠিত ও সুদৃঢ় করেন। আর নিজ গোত্রীয় শক্তির ওপর বেশি নির্ভরশীল হয়ে পড়েন। যার কারণে আবশ্যিকরূপে বনু উমাইয়্যার ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয়। যেহেতু সাধারণত ক্ষমতার পালাবদলের স্তর গৃহযুদ্ধের উৎস হয়, এ জন্য মুআবিয়া রাঃ এর আশঙ্কা ছিল, তার ওফাতের পর পাছে আবার কোনো সঙ্কট সৃষ্টি না হয়। তিনি ক্ষমতার পালাবদলকে এমন জটিলতা থেকে দূরে রাখতে চাইতেন, যা মতভিন্নতা ও কেন্দ্রবিমুখতার কারণে পরিণত হবে। তিনি অন্যান্য রাষ্ট্রের নিয়ম-পদ্ধতি হতে কিছু বিষয় প্রয়োজনীয়তার দিকে লক্ষ্য করে গ্রহণেরও পক্ষে ছিলেন। আর শরয়ি দিক দিয়ে তার অবকাশও ছিল। এ পরিস্থিতিতে স্বীয় সরকারের ষোলতম বছর [৫৬ হিজরিতে] মুআবিয়া রা. এক অস্বাভাবিক পদক্ষেপ গ্রহণ করলেন। তিনি তার পুত্র ইয়াজিদকে পরবর্তী খলিফারূপে ঘোষণা করেন। যদিও সাহাবায়ে কিরামের মতো শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্বের উপস্থিতিতে একজন নগণ্য ব্যক্তিকে স্থলাভিষিক্ত বানানো বিস্ময়কর ছিল বটে, তবে মুআবিয়া রা. দেখতে পাচ্ছিলেন, তার সরকারের অধিক উমাইয়া ও শামবাসীর শক্তির ওপর নিহিত। সুতরাং যদি তিনি পরিবারের বাইরের কোনো উত্তম ব্যক্তিকে মসনদের উত্তরাধিকারী ঘোষণা করেন, এরা গোত্রীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে তাকে মেনে নেবে না। আর উম্মাহ

গৃহযুদ্ধে লিপ্ত হয়ে যাবে। জুমহুর উলামায়ে কিরামের অভিমত হচ্ছে, মুআবিয়া রা.-এর এই পদক্ষেপের দুটি দিক ছিল। একটি নিজের পরবর্তী খলিফা নির্দিষ্ট করা। যাতে উম্মাহ একতাবদ্ধ ও একমত থাকে। এটা একেবারে সঠিক। অপর দিকটি হচ্ছে, নিজের পুত্রকে খলিফারূপে মনোনয়ন দেওয়া। এই দ্বিতীয় দিকটিতে মুআবিয়া রা. থেকে ইজতিহাদি বিভ্রাট

হয়েছিল। প্রশাসনিক অভিমত ও রাজনৈতিক প্রচেষ্টার স্তরে এ সিদ্ধান্ত সঠিক প্রমাণিত হয় নি। তথাপি তিনি তার এ কর্মে সদিচ্ছুক, নিষ্ঠাবান, সৎ ও উম্মতের কল্যাণকামী ছিলেন।তার কাছে এমন যুক্তিপ্রমাণ অবশ্যই ছিল, যার ভিত্তিতে তিনি এ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন এবং তার এ সিদ্ধান্ত সার্বিকভাবে শরয়ি বৈধতার সীমার আওতাভুক্ত ছিল। মুআবিয়া রা.-এর দৃষ্টিতে শামবাসীর নিকট পরবর্তী খলিফার গ্রহণযোগ্য হওয়া বেশ জরুরি ছিল। নতুবা কেন্দ্রে অস্থিরতা সৃষ্টি হবে এবং পুরো ইসলামি দুনিয়ার ওপর এর প্রভাব পড়বে। সুতরাং তিনি ক্ষমতার পালাবদলের ক্ষমতা নিজের কাছে রাখলেন এবং স্বীয় সুহৃদদের পরামর্শে নিজপুত্র ইয়াজিদকে পরবর্তী খলিফা ঘোষণা করলেন। যদিও এ ধরনের সিদ্ধান্ত রাজতন্ত্র ও উত্তরাধিকারী সরকার বা পরিবারতন্ত্রের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু মুআবিয়া রা. ভাবতেন, যদি মূল উদ্দেশ্য অর্থাৎ শরিয়তের শাসন অব্যাহত থাকে, তাহলে উত্তরাধিকারী সরকার বা পরিবারতন্ত্রের অবকাশ রয়েছে। কেননা, এর নিষেধাজ্ঞায় কুরআন ও সুন্নাতের কোনো অকাট্য ও স্পষ্ট বর্ণনা বিদ্যমান নেই। বরং কুরআনের বাণী থেকে স্বয়ং রাজতন্ত্র ও পরিবারতন্ত্রের অবকাশ প্রমাণিত হয়। আল্লামা ইবনু খালদুন রহ. মুআবিয়া রাঃএর এই সিদ্ধান্তের কারণের ওপর আলোকপাত করেছেন- 'যে বিষয়টা মুআবিয়া রাঃ কে অন্যদের স্থলে ইয়াজিদকে পরবর্তী খলিফা বানাতে তৎপর করে, তা ছিল উম্মতের ঐক্য ও ঐকমত্যের স্বার্থ। বনু উমাইয়্যার ব্যবস্থাপনা পরিষদ এতে একমত ছিল। ওই সময় তারা নিজেদের ছাড়া অন্য কারও ওপর সম্মত ছিল না। তারা কুরাইশের সবচেয়ে সুদৃঢ় শাখা ছিল। আর জাতির অধিকাংশই তাদের সাথে সম্পৃক্ত ছিল। এ জন্য মুআবিয়া রা. ইয়াজিদকে প্রাধান্য দিলেন এবং উত্তমের স্থলে অনুত্তমকে বেছে নিলেন। এটা ঐক্য ও ঐক্যমতের জন্যই করেছেন, শরিয়তে যার অনেক গুরুত্ব রয়েছে। হাফিজ ইবনু কাসির রহ. লিখেছেন- 'মুআবিয়া রা.-এর এই অভিমত ছিল যে, ইয়াজিদ খিলাফাতের যোগ্য। পুত্রের প্রতি পিতার তীব্র স্বভাবগত ভালোবাসার পাশাপাশি ইয়াজিদের জাগতিক ভদ্রতা, তার মধ্যে শাহজাদাসুলভ বৈশিষ্ট্যাবলি, সামরিক বিষয়াবলি সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা, সরকারি প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা পরিচালনার যোগ্যতা এবং এগুলো দায়িত্ব পালনের উপযুক্ততার কারণে তিনি এ অভিমত পোষণ করেছেন। আর তার ধারণা ছিল, সাহাবায়ে কিরামের সন্তানদের মধ্যে কেউ এমন সুচারুরূপে রাষ্ট্রীয় প্রশাসন সামলাতে পারবে না। ইয়াজিদকে পরবর্তী খলিফা মনোনয়নের কারণসমূহ এটা নিশ্চিত যে, শুরুতে মুআবিয়া রা.-এর মানসিকতায় ইয়াজিদের স্থলাভিষিক্ততার কোনো পরিকল্পনাই ছিল না। একবার ইরাকের গভর্নর জিয়াদ কোনো এক কাজের জন্য কাবীসা ইবনু জাবিরকে মুআবিয়া রাঃ এর কাছে প্রেরণ করলেন। তিনি আলোচনার মাঝে মুআবিয়া রাঃ কে জিজ্ঞাসা করলেন- 'আপনার পরে খিলাফাতের দায়িত্ব কে সামলাবে? মুআবিয়া রা. বললেন, "বিষয়টি মুসলিমদের দলের মাঝে ছেড়ে দেওয়া হোক। তারা বেছে নেবে কুরাইশের ভদ্র ব্যক্তি সায়িদ

ইবনু আসকে; অথবা লজ্জাশীল, পরহেজগার ও দানশীল কুরাইশ যুবক আবদুল্লাহ ইবনু আমিরকে; অথবা ভদ্র নেতা হাসান ইবনু আলিকে; অথবা কুরআনের কারি, আলেমে দ্বীন ও শরিয়তের সীমারেখার কঠোর অনুসারী মারওয়ান ইবনু হাকামকে; অথবা ফকীহ আবদুল্লাহ ইবনু উমরকে; অথবা মেধাবী ও সচেতন মানুষ আবদুল্লাহ ইবনু জুবাইরকে। এ ঘটনা হাসান ইবনু আলি রা.-এর জীবদ্দশার

[অর্থাৎ ৪৯ হিজরি সন বা তার আগের]। এতে অনুধাবন করা যায় যে, ওই সময় পর্যন্ত মুআবিয়া রা.-এর কল্পনাতেও খিলাফাতের বিষয়ে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত কোনো চিন্তা ছিল না।

এ ঘটনা হাসান ইবনু আলি রা.-এর জীবদ্দশার [অর্থাৎ ৪৯ হিজরি সন বা তার আগের]। এতে অনুধাবন করা যায় যে, ওই সময় পর্যন্ত মুআবিয়া রা.-এর কল্পনাতেও খিলাফাতের বিষয়ে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ব্যতিরেকে অন্য কোনো চিন্তা ছিল না। আর তার নিকট খিলাফাতের হকদার অন্য ব্যক্তিরাই ছিলেন। পরবর্তী সময়ে পরিস্থিতির পরিবর্তনের কারণে মুআবিয়া রা.-এর ইয়াজিদকে স্থলাভিষিক্ত করার ধারণা আসে। তিনি গভীর চিন্তাভাবনা করার পর যাকে বাস্তবে রূপ দেন। সম্ভবত চিন্তাভাবনার এ সময়টা ছিল ৪৯ হিজরি থেকে নিয়ে ৫২ হিজরি সালের মাঝামাঝি। এ সময় হাসান রা. পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন। হাসান রা.-এর প্রতি ভালোবাসার দাবীদাররা মুআবিয়া রা.-এর নীতির বিরুদ্ধে বিশৃঙ্খলাপরায়ণ ব্যক্তিদের প্রতি ঝুঁকে পড়ে। কুফায় বিদ্রোহের আশঙ্কা দেখা দেয়। আর ৫১ হিজরি সনে হুজুর ইবনু আদি রা.-এর মতো বুজুর্গের মূল্যবান জীবন কুরবানী হয়ে গেছে। সম্ভবত এ পরিস্থিতির কারণে মুআবিয়া রা. খিলাফাতের বিষয়টি মুসলিমদের শুরার ওপর সোপর্দ করতে নিশ্চিন্ত হতে পারেননি। ওই সময় ৫০ হিজরি সনে ইয়াজিদ কুসতুনতুনিয়া' অভিযানের নেতৃত্ব প্রদান করেন। আর ৫১ হিজরি সনে আমিরুল হজ্জ্ব (হজ্জের যাবতীয় কর্মকাণ্ড পরিচালনার নেতা) হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। যার দ্বারা মুআবিয়া রা. নিশ্চিন্ত হন যে, পুত্রের মাঝে নেতৃত্বের যোগ্যতা রয়েছে। এই দিকগুলো সামনে রেখে তিনি ইয়াজিদকে স্থলাভিষিক্ত বা তার পরবর্তী খলিফারূপে মনোনয়নের সিদ্ধান্ত নেন। আর এ ব্যাপারে কতিপয় আমিরের সাথে পরামর্শও করেন। তাবারির বর্ণনা- মুআবিয়া রা. যখন ইয়াজিদের পক্ষে বাইআত গ্রহণের ইচ্ছা করলেন, তখন যিয়াদের কাছে পত্র লিখে পরামর্শ চাইলেন। যিয়াদ উবাইদ ইবনু কাবকে ডেকে এ ঘটনা শুনিয়ে বললেন, 'এ ব্যাপারে আমিরুল মুমীনীনের জনগণের বিরোধিতার আশঙ্কা রয়েছে। আর তিনি তার সমর্থন চাচ্ছেন এবং আমার কাছে পরামর্শ চেয়েছেন। এটা ইসলামের বিষয় ও বেশ দায়িত্বশীলতার ব্যাপার। ইয়াজিদের মাঝে কিছু বেপরোয়াভাব রয়েছে এবং

শিকার করে বেড়ানোও তার খুব শখ। তুমি আমিরুল মুমীনীনের কাছে গিয়ে আমার পক্ষ থেকে ইয়াজিদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে অবগত করো এবং বলো, তিনি যেন এ ব্যাপারে তাড়াহুড়া না করেন।' উবাইদ বললেন, 'আমিরুল মুমীনীনকে তার পুত্র সম্বন্ধে বিরূপচিত্ত করানো সঙ্গত হবে না। আমি গিয়ে ইয়াজিদের সাথে সাক্ষাৎ করি। তাকে বলি যে, আমিরুল মুমীনীন তাকে পরবর্তী খলিফারূপে মনোনয়নের পরামর্শ করছেন। সে যেন এমন কর্মকাণ্ড পরিত্যাগ করে। যাতে করে জনগণের কথা বলার ও বিরোধিতা করার সুযোগ না ঘটে। যিয়াদ এ অভিমত সমর্থন করেন এবং উবাইদকে ইয়াজিদের নিকট পাঠিয়ে দেন। উবাইদের বোঝানো দ্বারা ইয়াজিদ তার অনেক কর্মকাণ্ড পরিত্যাগ করে। ব্যক্তিগত কৃতিত্বের দিক দিয়ে ইয়াজিদের যোগ্যতা! মুআবিয়া রা.-এর সিদ্ধান্তে একমত হয়ে যারা ইয়াজিদের মনোনয়নকে মেনে নিলেন, তাদের অবস্থানও শরয়ি সীমার বাইরে ছিল না। পরবর্তী শাসক মনোনয়নের শর্তাবলির আলোকে বিচার করা হলে দেখা যাবে, ইয়াজিদের প্রজ্ঞা, বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়া, মুসলিম হওয়া, সুস্থ ও কুরাইশী হওয়া এমন বাস্তবতা, যার দলিলের কোনো প্রয়োজন নেই। তিনি একটি জিহাদি অভিযানের নেতা ও হজ্জের আমিরও হয়েছিলেন। যার দ্বারা তার মধ্যে যুদ্ধ পরিচালনা ও প্রশাসনে কোনো-না-কোনো স্তরের যোগ্যতা প্রমাণিত হয়। সুতরাং তার বাহ্যিক অবস্থা দেখে এটা মেনে নেওয়ার অবকাশও বিদ্যমান ছিল যে, তিনি খিলাফাতের যোগ্য। এখন থাকল ইয়াজিদের

মদপান ও অন্যান্য খারাপ কর্মকাণ্ডে জড়িত হওয়ার বিষয়টি। তো যে সব বর্ণনা এটা প্রকাশ করে যে, তিনি আমিরে মুআবিয়া রা.- এর জীবদ্দশায় এসব কর্মকাণ্ডে অভ্যস্ত ছিলেন, তা জয়িফ (দুর্বল) ও যুক্তির বিচারে সন্দেহযুক্ত। হ্যাঁ এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, তিনি নেতৃত্বসুলভ উপযুক্ততা এবং ধর্মীয় ত্যাগ ও কষ্ট সাধনায় তৎকালীন অপর যোগ্য ও সৎ ব্যক্তিদের চেয়ে বেশ পিছে ছিলেন। তার মধ্যে দূরদর্শিতারও অভাব ছিল। স্বভাবে ঝটপটপ্রিয়তা, অস্থির মানসিকতা ও বেপরোয়া মনোভাব স্পষ্ট ছিল। খলিফা হওয়ার পর তার কিছু সিদ্ধান্ত যেমনটা প্রমাণ করেছে। এছাড়াও তিনি বিনোদনমূলক কর্মকাণ্ডে সতর্ক সীমার বাইরে অধিক লিপ্ত থাকতেন। যদি এ গুণাবলি কোনো সাধারণ মানুষের মধ্যে হতো, তাহলে সম্ভবত কেউ তার ওপর আপত্তি তুলত না; কিন্তু যেহেতু ইয়াজিদকে ভবিষ্যতের খলিফা হিসেবে দেখা হচ্ছিল, এ জন্য দোষগুলো বেশ মারাত্মক অনুভব হচ্ছিল। মুআবিয়া রা.-এর নিজের কাতারে শামিল বিশিষ্ট ব্যক্তি যেমন আমর ইবনু হাযম রহ., আহনাফ ইবনু কাইস রহ. ও যিয়াদ ইবনু আবি সুফইয়ানের ইয়াজিদের মনোনয়নের প্রতি ব্যক্তিগতভাবে একমত না হওয়া সম্ভবত ইয়াজিদের গুণাবলিতে এ ধরনের ঘাটতির কারণে হয়েছিল। পক্ষান্তরে মদিনার প্রবীণদের আপত্তি এই কারণেও ছিল যে, তারা ইসলামি শুরা পদ্ধতি ও সীমাবদ্ধতা

দেখছিলেন। মুসলিমদের রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনাকে পরিবারতন্ত্রে পরিবর্তন হতে বাহ্যত ইয়াজিদের দুর্বলতাগুলো নিঃসন্দেহে আমিরে মুআবিয়া রা.-এর কাছে গোপন ছিল না; কিন্তু তিনি হয়তোবা আশা করেছিলেন, দায়িত্বের বোঝা অর্পণের পর এই ত্রুটিগুলো দূর হয়ে যাবে। তিনি হয়তোবা এটাও আশা করেছিলেন যে, ইয়াজিদ প্রতিটি পদক্ষেপে রাষ্ট্রীয় প্রশাসনে যুক্ত শীর্ষ যোগ্যতাসম্পন্ন আমির ও উপদেষ্টাদের পথপ্রদর্শন পেতে থাকবে। যার কারণে তিনি ভুল পদক্ষেপ থেকে বেঁচে থাকবেন। এর পাশাপাশি আমিরে মুআবিয়া রা. নিজেও ইয়াজিদকে তার অভিজ্ঞতার আলোকে এমন এমন উপদেশ ও পথনির্দেশনা প্রদান করেছেন, যাকে সামনে রেখে তিনি একজন সফল শাসক হতে পারতেন।

মুআবিয়া রা. এ ব্যাপারে ইসতেখারা ও দুআর পথও অবলম্বন করেছিলেন। তিনি জুমআর দিন মিম্বরে এই দুআ করেছিলেন, 'হে আল্লাহ, যদি তুমি জানো যে, আমি ইয়াজিদকে তার যোগ্যতার কারণে পরবর্তী খলিফারূপে মনোনয়ন দিয়েছি, তাহলে এই পদকে পরিপূর্ণতা দান করো, যা আমি তাকে দিয়েছি। আর যদি আমি তাকে আমার ভালোবাসার কারণে পরবর্তী খলিফারূপে মনোনয়ন দিয়ে থাকি, তাহলে তার জন্য এই পদকে পূর্ণতা দান করো না, যা আমি তাকে দিয়েছি। এর দ্বারা অনুমান করা যেতে পারে যে, মুআবিয়া রা. পূর্ণ নিষ্ঠার সাথে উম্মতের কল্যাণকামিতায় ইয়াজিদকে পরবর্তী খলিফারূপে মনোনয়নের সিদ্ধান্ত, নিয়েছিলেন। আর তিনি ইয়াজিদের দুর্বলতা সম্পর্কে অবহিত থাকাসত্ত্বেও নিশ্চিন্ত ছিলেন যে, ইয়াজিদ সঠিকভাবে সরকার পরিচালনা করবেন। যার কারণে মুআবিয়া রা. জরুরি ব্যবস্থাপনার আয়োজন করে তাকে দুআ, মূল্যবান উপদেশ ও যোগ্য সহচরবৃন্দের পাথেয় দিয়ে যাচ্ছিলেন। সর্বোপরি তিনি গায়েবের জ্ঞানী ছিলেন না যে, ভবিষ্যতের মর্মান্তিক পরিস্থিতি অবলোকন করবেন এবং স্বীয় সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করবেন।

পরবর্তী খলিফারূপে ইয়াজিদের মনোনয়ন:

পরবর্তী খলিফারূপে ইয়াজিদের মনোনয়ন: একটি টেস্ট কেস মূলত আমিরে মুআবিয়া রা.-এর ইয়াজিদকে পরবর্তী খলিফারূপে মনোনয়ন প্রদান একটি যাচাই প্রক্রিয়া বা 'টেস্ট কেস' ছিল। যাকে পরবর্তী ফলাফলের ভিত্তিতে সফলতা বা ব্যর্থতা বলে অভিহিত করা যায়। আমিরে মুআবিয়া রা. এই যাচাই প্রক্রিয়ার ফলাফল দেখার জন্য জীবিত ছিলেন না। যাচাই প্রক্রিয়াকে ব্যর্থ বলা যেতে পারে, কিন্তু এর ভিত্তিতে আমিরে মুআবিয়া রা.-এর উদ্দেশ্য নিয়ে সন্দেহ করা ভদ্রতা ও ন্যায়বিচার বহির্ভূত আচরণ। নিঃসন্দেহে এ যাচাই প্রক্রিয়া ব্যর্থ হয়েছে। যদি

মুআবিয়া রা. ওই সময় জীবিত থাকতেন, তাহলে নিশ্চয় বিষয়টিকে ওখানেই শেষ করে দিতেন। আর এটাও ঐতিহাসিক সত্য যে, তারই পৌত্র মুআবিয়া ইবনু ইয়াজিদ এমনটাই করেছেন। তিনি পরিবারতন্ত্রের যাচাই প্রক্রিয়াকে ওখানেই শেষ করে দিয়ে শাসনক্ষমতা উম্মতের শুরার ওপর সোপর্দ করেন।মাওলানা মুহাম্মাদ কাসেম নানুতুবি রহ. 'মাজহাবে আমিরে মুআবিয়া দারবারেয়ে খিলাফাত' শিরোনামে লিখেছেন- খিলাফাত সম্পর্কে আমিরে মুআবিয়া রা.-এর দর্শন ছিল, রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের জ্ঞান অন্যদের চেয়ে যার বেশি, হোক তারা তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ, তো অন্যদের চেয়ে তাকে খলিফা বানানো উত্তম। এ কথার দিকে তাকিয়ে তিনি ইয়াজিদকে অন্যদের চেয়ে উত্তম ভেবেছেন। আর যদি ধরে নেওয়া যায় অন্যদের চেয়ে উত্তম নাও ভাবা হতো, তবুও এর চেয়ে বেশি কথা হতে পারে না যে, তিনি উত্তম ছেড়ে দিয়েছেন। যেমনটা বিগত আলোচনায় স্পষ্ট হয়েছে যে, উত্তমকে খলিফা বানানো উত্তম, ওয়াজিব নয়; কিন্তু এত কথাসত্ত্বেও উত্তম পরিত্যাগের পাপ আমিরে মুআবিয়া রাঃ এর ওপর চাপিয়ে দেওয়া যাবে না।

উম্মতের পক্ষে মুআবিয়া রা.-এর ইয়াজিদকে অসিয়ত:

মুআবিয়া রা. পরবর্তী উম্মতের জন্য বেশ চিন্তা করতেন। তিনি চেয়েছিলেন, ইয়াজিদ মুসলিম উম্মাহর জন্য এক আদর্শ শাসক প্রমাণিত হবেন। উম্মত তার ওপর ঐকমত্য থাকবে। চতুর্দিকে শান্তি ও নিরাপত্তা বিরাজ করবে। কারও ওপর কেউ নির্যাতন করবে না, কারও অধিকারও হরণ হবে না। যেহেতু এ ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি দায় ইয়াজিদের ওপরই আরোপিত হবে, এ জন্য মুআবিয়া রা. তাকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ অসিয়ত করেন, যার প্রতিটি বাক্য সোনার হরফে লিখে রাখার মতো। এ অসিয়তগুলো তার পরিণামদর্শিতা ও সর্তকতা, চিন্তা ও দর্শনের গভীরতা, রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা এবং উম্মতের কল্যাণকামনার শ্রেষ্ঠ দলিল। মুআবিয়া রা. ইয়াজিদকে বলেন- * আল্লাহকে ভয় করবে। আমি তোমার জন্য খিলাফাতের এ পদটি চূড়ান্ত করে দিয়েছি। তোমাকে এর দায়িত্বশীল বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। * যদি উত্তমের সাথে থাকো, তাহলে সেটা আমার সৌভাগ্য হবে। আর যদি এমনটা না করো, তাহলে সেটা হবে তোমার দুর্ভাগ্য। * মানুষের সাথে কোমল আচরণ করবে। 'তোমার কাছে তোমার সম্বন্ধে যে সব হীনকর ও আপত্তিজনক কথা পৌঁছবে, সেগুলো উপেক্ষা করবে। সম্ভ্রান্তদের সাথে কঠোর আচরণ করবে না। তাদের সম্মানহানি থেকে বেঁচে থাকবে। তাদের নিজের কাছে রাখবে। * যখনই কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সম্মুখীন হবে, তখনই প্রবীণ, অভিজ্ঞ, সৎ ও পরহেজগার ব্যক্তিদের সাথে পরামর্শ করবে। তাদের অভিমতের বিরোধিতা করবে না। *

নিজের মতের ওপর কখনো চাপ প্রয়োগ করবে না। কেননা, শুধু এক মানসিকতা থেকে আসা অভিমত সঠিক হয় না। * নিজের আত্মার পরিশুদ্ধির ব্যবস্থা করবে। মানুষেরাও তোমার সাথে সঠিকভাবে চলবে। * মানুষকে কখনো

কোনো আপত্তির সুযোগ দেবে না। কেননা, মানুষ মন্দ কথা দ্রুত ছড়িয়ে দেয়। * নিয়মিত জামাআতের সাথে নামাজ আদায় করতে থাকবে। যদি এই উপদেশগুলো মেনে চলো, তাহলে মানুষ তাদের ওপর তোমার অধিকার অনুধাবন করবে। আর তোমার সরকার শক্তিশালী থাকবে। মুআবিয়া রা.-এর শেষ দিনগুলি এবং ওফাত মুআবিয়া রা.-এর বয়স ৮০ বছর পার হয়ে গেছিল।' বার্ধক্য অবস্থায় সরকারি কাজকর্মের কষ্ট তাকে ক্লান্ত করে দিয়েছিল। তিনি চিরস্থায়ী ডাকের পদধ্বনি অনুভব করছিলেন। এক দিন তিনি খুতবায় বললেন- "হে লোকসকল, আমি কর্তিত ফসলের একটি অংশ। আমি তোমাদের দায়িত্বশীল হয়েছি। আমার পরও শাসক আসবেন। আমি তাদের থেকে উত্তম। যেমনটা যারা আমার থেকে আগে চলে গেছেন, তারা আমার থেকে উত্তম। [হাদিসে] বলা হয়েছে, যে আল্লাহর সাথে মিলিত হতে ভালোবাসে, আল্লাহ তাআলাও তার সাথে মিলিত হতে ভালোবাসেন। হে আল্লাহ, আমি আপনার সাক্ষাৎকে ভালোবাসি, আপনিও আমার সাথে সাক্ষাৎ ভালোবাসেন। আর এতে বরকত প্রদান করুন। তিনি এতটাই দুর্বল হয়ে গিয়েছিলেন যে, কব্জি দুটোকে শুকনো ডালের মতো মনে হতো। তিনি বলতেন, 'ব্যস দুনিয়া এরচেয়ে বেশি কিছু নয়, যা আমরা উপভোগ করেছি ও উপার্জন করেছি। আল্লাহর কসম, আমাকে যদি ক্ষমতা দেওয়া হয়, তাহলে আমি তিন দিনের বেশি তোমাদের মাঝে থাকব না। মুআবিয়া রা.-এর কাশিতে রক্ত আসতে লাগল। শেষ দিনগুলিতে বিছানাগত হয়ে গেছিলেন। তার দুই পুত্র তার পার্শ্ব পরিবর্তন করে দিতেন। আর তিনি বলতেন, 'এরা ওই ব্যক্তিকে ওলটপালট (পার্শ্ব পরিবর্তন) করে দিচ্ছে, যে দুনিয়াকে ওলটপালট করে দিতে দক্ষ ছিল।' রোগের এত তীব্রতাসত্ত্বেও শাসনের প্রভাব-প্রতিপত্তি ও দাপট টিকিয়ে রাখার এতটাই খেয়াল ছিল যে, সাধারণ জনগণের মাঝে তার বিছানাগত হওয়ার বিষয়টি একেবারে প্রকাশ হতে দেননি। যখন মানুষ দেখতে আসত, গৃহবাসীদের বলতেন, 'আমাকে সুরমা ও তেল লাগিয়ে বালিশে হেলান দিয়ে বসিয়ে দাও। কোনো আগন্তুক যেন না বসে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সালাম দিয়ে চলে যাবে।মানুষ ভেতরে আসে। সালাম করে। আর তাকে হাসিখুশি দেখে এ বলতে বলতে চলে যায় যে, আমিরুল মুমিনিন ঠিকঠাক আছেন। মানুষজন চলে যাওয়ার পর তিনি কবিতা পাঠ করতেন- অকল্যাণকামীদের সামনে আমি শক্তিশালী হয়ে থাকি। যাতে তাদের দেখাই যে, যুগের যাতনাসত্ত্বেও আমি দুর্বল হই নি। কিন্তু মৃত্যু যখন তার থাবায় পিষে দেবে, তখন সর্বপ্রকার তাবীজকে অকার্যকর পাবে। একজন সাচ্চা মুমিনের মতো মুআবিয়া রাঃ এর শিরায় শিরায় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা ছিল। মৃত্যুরোগে পরিবারের লোকদের বললেন, 'রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে একটি জামা পরিধান করিয়েছিলেন। ওটা আমি যত্ন করে রেখেছি। একবার আমি তার নখ মুবারক কেটেছিলাম। সেটাও একটি শিশিতে সংরক্ষণ করে রেখেছি। আমি মারা গেলে ওই জামাতেই আমাকে কাফন দেবে। আর ওই কর্তিত নখ মুবারক পিষে আমার চোখে মুখে ছিটিয়ে দেবে। আশা করা যায়, আল্লাহ তাআলা এগুলোর বরকতে আমার ওপর দয়া করবেন।' আল্লাহভীতির এমন এক অবস্থা ছিল যে, ওফাতের আগে তিনি তার অর্ধেক সম্পদ বাইতুল মালে জমা করে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। যদি অজান্তে বাইতুল মালের অর্থের মধ্যে কোনো কমবেশি হয়ে থাকে, এগুলো যেন তার ক্ষতিপূরণ হিসেবে কাজ করে। শেষ মুহূর্তে ওয়ারিসদের বললেন, "মহান ও শ্রেষ্ঠ 'আল্লাহকে ভয় করবে। যে আল্লাহ তাআলাকে ভয় করে, আল্লাহ তাকে হেফাজত করেন।আল্লাহ তাআলাকে ভয় করে না, তার হেফাজতকারী কেউ নেই।" কিছুক্ষণ পর তার রূহ মাটির দেহ ছেড়ে চলে যায়। জাহহাক ইবনু কাইস ফিহরি রা. জানাজার নামাজ পড়ান। মুআবিয়া রা.-কে দামেশকেই দাফন করা হয়। মুআবিয়া রা. বিশ বছর গভর্নরের দায়িত্ব পালন করেন। এরপর বিশ বছর খিলাফাতের

দায়িত্ব পালন করেছিলেন। একটি বর্ণনা মোতাবেক বৃহস্পতিবার, ২২ রজব, ৬০ হিজরি মুআবিয়া রা.-এর ওফাত হয়।' অবশ্য অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত বর্ণনামতে মৃত্যুর তারিখ ৪ রজব।

ইয়াযিদের খুৎবা

আমীরে মুয়াবিয়া রাঃ এর ইন্তেকালের সময় ইয়াযিদ ছিল হিমসের হাওয়ারীন দূর্গে। সেখান থেকে মৃত্যুর সংবাদ শুনে দ্রুত রাজধানী দামেশকে চলে আসে। ইয়াযিদ আসার আগেই হযরত মুয়াবিয়া রাঃ এর দাফন সম্পন্ন হয়ে যায়। [সিয়ারু আলামিন নুবালা-৩/১৬২] ইয়াযিদের প্রথম খুৎবা ইয়াযিদ রাষ্ট্রের সভাসদ এবং দামেশবাসীর উদ্দেশ্যে শোকবার্তা বক্তব্যে হামদ ও সানার পর বলেন, "মুয়াবিয়া রাঃ নিঃসন্দেহে আল্লাহর বান্দাদের মধ্য থেকে একজন বান্দা ছিলেন। আল্লাহ তাআলা তার উপর অনুগ্রহ বর্ষণ করেছেন। তারপর নিজের কাছে নিয়ে গিছেন। তিনি পূর্ববর্তীদের থেকে মর্যাদার দিক থেকে কম হলেও পরবর্তীদের থেকে উত্তম ছিলেন। আমি তাকে আল্লাহর কাছে তাঁর পক্ষে সাফাই গাইছি না। কেননা, আল্লাহ তাআলাই তার ব্যাপারে ভালো জানেন। যদি তার ক্ষমা হয়, তাহলে এটা আল্লাহর রহমাত। আর যদি পাকড়াও হন, তাহলে তা নিজের পদস্খলনের কারণে। তারপর যিম্মাদারী আমাকে

দেয়া হয়েছে। কোন কিছুর অন্বেষণে আমি ব্যথিত নই এবং কোন কিছুর বর্জনে আমি কৈফিয়ত দানকারী নই। কিন্তু যা আল্লাহ তাআলা মঞ্জুর করেন, তা'ই হয়। [আলবিদায়া ওয়াননিহায়া-৮/১৪৩, ইফাবা-৮/২৭২] ইয়াযিদের এ খুতবা প্রমাণ করে, সে খলীফা হবার সময় প্রকাশ্য ফাসিক ছিল না। যা আমভাবে মনে করা হয়ে থাকে। বক্তৃতায়ও সে ছিল বেশ পারদর্শী। বাইয়াতের জন্য বার্তাবাহক প্রেরণ আমীরে মুয়াবিয়া রাঃ এর শেষ জমানায় কুফায় নু'মান বিন বশীর রাঃ, বসরায় উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদ এবং মদীনায় ওলীদ বিন উতবা গভর্ণর ছিল। ইয়াযিদ খলীফা হবার পর তাদের স্বপদে বহাল রাখেন। নিঃসন্দেহে এটা তার বুদ্ধিমত্তা এবং দূরদর্শিতার পরিচায়ক। [আলবিদায়া ওয়াননিহায়া-৮/১৪৬, ইফাবা-৮/২৭৭] দায়িত্বগ্রহণের পর ইয়াযিদ পুরো মুসলিম মিল্লাতের মাঝে হযরত মুয়াবিয়া রাঃ এর ইন্তেকাল এবং নিজের খিলাফতের বাইয়াত গ্রহণের আহবান করে বার্তাবাহক প্রেরণ করেন।

হযরত মুয়াবিয়া রাঃ এর জীবদ্দশায়ই হযরত হুসাইন রাঃ এবং তার সাথে হযরত আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের রাঃ এর অবস্থান এই ছিল যে, পৈত্রিক রাজত্ব পদ্ধতি পরিহার করে খোলাফায়ে রাশেদীনেন জামানার শুরায়ী নিজামে খলীফা নির্ধারণ পদ্ধতি অনুসরণ করা উচিত। আর এ দায়িত্ব উম্মতের গুরুত্বপূর্ণ ও সেরা ব্যক্তিদের অধীনত হওয়া উচিত। এ কারণেই তারা উভয়ে ইয়াযিদকে 'পরবর্তী খলীফা নির্ধারণ' বাইয়াত থেকে বিরত ছিলেন। তাদের উভয়ের ইয়াযিদের কাছে বাইয়াত হয়ে যাওয়ার বিষয়টি 'রুখসত' তথা ছাড় দেয়া হিসেবে করার সুযোগ ছিল। কিন্তু 'আযীমত' বা দৃঢ়তা এটাই ছিল যে, পৈত্রিকসূত্রে খলীফা হবার এ পদ্ধতিকে বাতিল করার চেষ্টা করা, যাতে করে এ প্রচলনের হাত ধরে পরবর্তীতে বড় কোন ফিতনা তৈরী না হয়। তারা উভয়ে আযীমতের উপর আমল করে প্রাথমিক পদ্ধতি হিসেবে ইয়াযিদের হাতে বাইয়াত গ্রহণ থেকে নিজেকে বিরত রাখেন। যাতে করে অন্যরাও ইসলামী রাষ্ট্রনায়ক নির্বাচনের পূর্বের পদ্ধতির যথার্থতা অনুধাবনে সচেতন থাকেন।

হযরত হুসাইন রাঃ কি বিদ্রোহ করতে চেয়েছিলেন?

প্রাথমিকভাবে হযরত হুসাইন রাঃ এবং হযরত আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের রাঃ এর মানসিকতা এতোটুকুই ছিল যে, তারা ইয়াযিদের হাতে বাইয়াত হবেন না। ব্যস, এতটুকুই। এমন কোন বিশুদ্ধ বর্ণনা পাওয়া যায় না, যার মাধ্যমে একথা বুঝা যায় যে, তারা ইয়াযিদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের প্রস্তুতি নিয়েছেন। অথচ হযরত হুসাইন রাঃ এর কাছে মুয়াবিয়া রাঃ এর জীবদ্দশা থেকেই কুফার পত্র আসছিল। যেন তিনি সেখানে চলে যান এবং উম্মতে মুসলিমার নেতৃত্ব

নিজ কাঁধে তুলে নেন। [আলমু'জামুল কাবী তাবারানীকৃত-৩/৭০] কিন্তু এমন কোন বিশুদ্ধ বর্ণনা নেই, যাতে প্রমাণ হয় যে, হযরত হুসাইন রাঃ সেসব পত্রের জবাব দিয়েছেন বা তাদের আহবানের প্রতি আগ্রহ দেখিয়েছেন। বরং প্রাথমিক ঘটনাপ্রবাহ পরিস্কার জানান যে, ইয়াযিদ খলীফা হবার পরও হযরত হুসাইন রাঃ কুফায় যাবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেননি। মদীনায় পুরো জীবন কাটিয়ে দিতে চেয়েছেন। সেই সাথে নিজের ফাতওয়া অনুপাতে বাইয়াত থেকেও বিরত থাকতে মনস্থির করেছিলেন। কিন্তু যখন ইয়াযিদের হাতে বাইয়াত হতে তাকে চাপ সৃষ্টি করা হল। তখন তিনি বাধ্য হয়ে মদীনা ছাড়লেন। কুফায় যাবার বিষয় নিয়েও ভাবতে শুরু করলেন। [আনছাবুল আশরাফ-৩/১৫৫-১৫৬] ইয়াযিদের রাজনৈতিক প্রথম ভুল পদক্ষেপ ইয়াযিদের জন্য উচিত ছিল যে, যারা বাইয়াত হতে চাননি, সেসব নেতৃস্থানীয় বড় ব্যক্তিদের বিষয়ে নাক না গলানো। হযরত আলী রাঃ ও তার খিলাফতের জামানায় বাইয়াত হতে না চাওয়া নেতৃস্থানী কারো উপর চাপ সৃষ্টি করেননি। বাইয়াত না হবার কারণে তাদের সাথে দুর্ব্যবহার করেননি। সম্মান প্রদর্শনে কোন কমতি করেননি। ঠিক তেমনি হযরত মুয়াবিয়া রাঃ তার জমানায় যারা ইয়াযিদকে পরবর্তী খলীফা হিসেবে বাইয়াত হতে অস্বিকৃতি জানিয়েছেন, তাদের প্রতি বিরূপ ছিলেন না। তাদের সাথে কঠোরতা করেননি। বাইয়াত হতে বাধ্য করেননি। কিন্তু ইয়াযিদ তার খিলাফাতের জমানায় প্রথম যে মারাত্মক ভুলটি করেছিলো, তা হলো সে মুরব্বী ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গকে দ্রুত বাইয়াত গ্রহণে চাপ সৃষ্টি করতে থাকে। [আলবিদায়া ওয়াননিহায়া-৮/১৪৬-১৪৭, ইফাবা-৮/২৭৭-২৭৮] এর মাধ্যমে তার মরহুম পিতার সেই অমূল্য নসিহতকে অগ্রাহ্য করে, যাতে ছিল যে, 'নেতৃস্থানীয় মুরব্বীদের সাথে কঠোরতা করবে না। এবং তাদের উপর নিজের সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিতে জোরাজুরি করবে না'। [আলবিদায়া ওয়াননিহায়া-৮/২৫১-২৫২] এই মূল্যবান ওসিয়ত ভুলে গিয়ে ইয়াযিদ মারাত্মক ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। যার ফলে পরিস্থিতি ধীরে ধীরে খারাপের দিকে মোড় নেয়।

ওলীদের নামে ইয়াযিদের পত্র

বিশুদ্ধ বর্ণনা মোতাবিক ইয়াযিদ সিংহাসনে আরোহণের পর হযরত মুয়াবিয়া রাঃ এর আযাদকৃত গোলাম রুযাইককে মদীনার গভর্ণর ওলীদ বিন উতবার নিকট প্রেরণ করে। এই মর্মে হুকুম দেয় যে, ওলীদ যেন হযরত হুসাইন রাঃ, হযরত আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের রাঃ কে তরিৎ তার নিজের কাছে ডেকে আনে এবং তাদের থেকে বাইয়াত নেয়। এই বার্তাবাহকই হযরতে মুয়াবিয়া রাঃ এর ইন্তেকালের সংবাদও নিয়ে যায়।

পত্রবাহক যখন মদীনায় পৌঁছে, তখন রাত হয়ে গিয়েছিল। সে অনেক চেষ্টা মেহনত করে গভর্ণর ওলীদ বিন উতবার সাথে সাক্ষাৎ করে গুরুত্বপূর্ণ সংবাদটি পৌঁছায়। [তারীখে খলীফা বিন খাইয়্যাত-২৩২, আলইকদুল ফরীদ-৫/১২৫] আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের এবং হুসাইন রাঃ এর মদীনা থেকে মক্কা রওনা ওলীদ বিন উতবা সংবাদ পাবার সাথে সাথেই প্রথমে হযরত আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের রাঃ এবং তারপর হযরত হুসাইন রাঃ কে গভর্ণর ভবনে তলব করে। বাইয়াত হবার জন্য অনুরোধ করে। হযরত আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের রাঃ জবাবে বলেন, "বাইয়াত হবার এটা কোন সময় নয়। তাছাড়া আমার মত ব্যক্তি একাকী লুকিয়ে বাইয়াত হবো না। আপনি কালকে মিম্বরে বসে আমার বাইয়াত গ্রহণ করুন"। এরই মাঝে হযরত হুসাইন রাঃ উপস্থিত হলেন। ওলীদ বিন উতবা নরম স্বভাবের মানুষ ছিলেন। তিনি যখন হযরত আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের রাঃ এর যুক্তিকে সঠিক মনে করে কালকে বাইয়াত হবার সিদ্ধান্ত নিলেন। তখন হযরত হুসাইন রাঃ কে বাইয়াত হবার জন্য কোন চাপ সৃষ্টি করলেন না। উভয়কে বাইয়াত ছাড়াই যাবার অনুমতি দিয়ে দিলেন। তবে খবর রাখার জন্য সাথে কিছু লোককে পাঠালেন। তারা উভয়ে বুঝে গেলেন যে, বাইয়াত হুসাইন ও আব্দুল্লাহ বিন যুবায়েরের মক্কা গমন
না হলে তাদের উপর রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে কঠোরতা করা হবে।

হুসাইন ও আব্দুল্লাহ বিন যুবায়েরের মক্কা গমন

রাতের শেষ প্রহরে আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের রাঃ অপ্রসিদ্ধ একটি রাস্তা দিয়ে মদীনা থেকে বের হয়ে মক্কা রওনা হয়ে গেলেন। [তারীখে খলীফা বিন খাইয়্যাত-২৩২] ওলীদ যখন সকালে তার অনুপস্থিতির কথা জানতে পারলো, তখন তার খোঁজে ৩০ বা ৮০ জন ঘোরসওয়ার প্রেরণ করল। কিন্তু তারা আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের রাঃ এর টিকিটাও খুঁজে পেল না। [আনছাবুল আশরাফ-৫/৩০০, বালাজুরীকৃত, তারীখে তাবারী-৫/৩৪১]এক দুইদিন পর হযরত হুসাইন রাঃ তার পরিবারসহ মদীনা থেকে মক্কা রওনা হবার প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন। মদীনা থেকে মক্কাকে নিরাপদ আশ্রয় মনে করার কারণ এই ছিল যে, একেতো মক্কা পবিত্র শহর। রাষ্ট্রপক্ষীয় দায়িত্বশীলরা ক্ষমতা প্রয়োগ করে উক্ত পবিত্র ভূমির পবিত্রতা বিনষ্ট করার সাহস করবে না। দামেশক থেকে মদীনা কাছে। কিন্তু মক্কা বেশ দূরে। তাছাড়া মদীনার তুলনায় মক্কা ছিল পাহাড়ে ঘেরা শহর। যাতে সহজেই রাষ্ট্রীয় সেনাদের থেকে নিজেকে লুকিয়ে রাখা সহজতর ছিল। এসকল কারণে হযরত হুসাইন রাঃ এবং আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের রাঃ মদীনা ছেড়ে মক্কায় নিজেদের অধিক নিরাপদ মনে করলেন। হুসাইন রাঃ এর মদীনা রওনা হবার

সময় আব্দুল্লাহ বিন উমর রাঃ এর সাথে সাক্ষাৎ করেন।ইবনে উমর রাঃ পরামর্শ দিলেন যেন তিনি কোথাও না যান। কিন্তু হুসাইন রাঃ কুফা থেকে পাওয়া পত্রগুলো দেখালেন। পত্রগুলো দেখে হযরত ইবনে উমর রাঃ মন্তব্য করলেন, "হুসাইন! আপনি তাদের কাছে যাবেন না"। কিন্তু হুসাইন রাঃ কুফাবাসীকে বিশ্বাস করে ইবনে উমরের কথা মানলেন না। ইবনে উমর রাঃ বিদায় মুহুর্তে হযরতে হুসাইন রাঃ এর গলা জড়িয়ে ধরে অনেক কাঁদলেন। কেঁদে কেঁদে বললেন, "হে শহীদ! তোমাকে আল্লাহর কাছে সোপর্দ করলাম"। হযরত হুসাইন রাঃ মদীনা থেকে মক্কা রওনা হয়ে গেলেন। পথিমধ্যে হযরত আব্দুল্লাহ বিন মুতী' রাঃ এর সাথে সাক্ষাৎ হয়। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "কোথায় যাচ্ছেন"? তখন হযরত হুসাইন রাঃ জবাবে বললেন যে, আপাতত মক্কা যাচ্ছি, তারপর ভবিষ্যতে কী করবো? সেখানে গিয়ে এ বিষয়ে ইস্তিখারা করবো। এর মাধ্যমে বুঝা যায় যে, হযরত হুসাইন রাঃ মক্কায় যাবার সময়ও কুফায় যাবার দৃঢ় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেননি। যদি তা'ই করতেন, তাহলে মক্কায় গিয়ে ইস্তিখারা করে সিদ্ধান্ত নেবার কথা বলতেন না। তাছাড়া মদীনা থেকে কুফা তুলনামূলক কাছে। যদি কুফায় যাবারই দৃঢ় সিদ্ধান্ত থাকতো, তাহলে তিনি মক্কায় না গিয়ে খুব সহজে মদীনা থেকেই কুফায় চলে যেতে পারতেন। প্রসিদ্ধ বর্ণনা অনুপাতে ২৭ বা ২৮ রজব রবিবার দিন হযরত হুসাইন রাঃ মদীনা থেকে রওনা হন। তারপর দ্রুত সফর করে ৩ বা ৪ শাবান মক্কায় আগমন করেন। মক্কায় তিনি ৬০ হিজরীর ৮ই জিলহজ্জ পর্যন্ত তথা ৪ মাস ৫ দিন অবস্থান করেন। এই সময়ের মাঝে সার্বিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে ছিলেন। [তারীখে তাবারী-৫/৩৮১, আনছাবুল আশরাফ-৩/১৬০] হুসাইন রাঃ এর আন্দোলনের আসল রহস্য হযরত হুসাইন রাঃ ঐ ব্যক্তিত্ব যিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তত্ত্বাবধানে উচ্চতর ঈমানী শক্তি এবং চারিত্রিক উৎকর্ষতা অর্জন করেছেন। হযরত আবু বকর রাঃ, হযরত উমর রাঃ এবং হযরত উসমান রাঃ এর স্নেহ মোহাব্বতই শুধু পাননি, বরং তাদের সংশ্রবে আত্মিক শক্তি অর্জন করেছিলেন। পুরো উম্মতে মুসলিমার মাঝে সবচেয়ে উঁচু বংশ নবীর বংশীয় ছিলেন। আলী রাঃ এর মত হায়দারে কাররারের ইলম, ফাকাহাত, জ্ঞান, রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ইত্যাদিরও জানেশীন ছিলেন। দ্বীনী বিষয়ে অগাধ পাণ্ডিত্ব, ইলমী গভীরতা, দ্বীনদারী, আমানতদারী, খুলুসিয়্যাত, লিল্লাহিয়্যাত, নির্ভীকতা, এককথায় তৎকালিন সময়ে তিনি অদ্বিতীয় যোগ্য ও মহান ব্যক্তিত্ব ছিলেন। অনভিজ্ঞ, রক্ত গরম আবেগী কোন যুবক ছিলেন না হযরতে হুসাইন রাঃ। ষষ্ঠ দশক পেরিয়ে ৭ম দশকে পৌঁছার নিকটবর্তী ছিল বয়স। এমন ব্যক্তিত্ববান মানুষের ক্ষেত্রে এমন ধারণা করা মোটেও যুক্তিসঙ্গত নয় যে, তিনি কেবল ইয়াযিদের ব্যক্তিগত দুর্বলতা এবং তার পাপাচারের প্রোপাগান্ডা শুনে তার হাতে বাইয়াত নিতে অস্বিকৃতি জানিয়েছেন। বরং এর পেছনে নিশ্চয় কোন বড় কারণ ছিল। সেটা হল, তিনি তার দূরদৃষ্টির মাধ্যমে একথা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, যদি এভাবে শাসকের সন্তান শাসক হবার প্রথা চালু হয়ে যায়,

তাহলে তা পরবর্তীতে মুসলিম মিল্লাতের জন্য বিরাট ক্ষতির কারণ হতে পারে। অনেক অযোগ্য ও অথর্ব সন্তানও কেবল বাবা শাসক ছিল বলে শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে যাবে। ফলে মুসলিম জাহানের অপূরণীয় ক্ষতি সাধিত হবে। তিনি একথার দাবী একবারও করেননি যে, ইয়াযিদ শাসক হবার যোগ্য নয়। এমনকি ইয়াযিদ ফাসিক, পাপাচারী এমন অভিযোগও হযরতে হুসাইন রাঃ থেকে কোন বিশুদ্ধ সনদে প্রমাণিত নয়। বরং তার মূল দাবী ছিল, ইয়াযিদের খলীফা নিযুক্তকরণ পদ্ধতি সঠিক ছিল না। এটা পরবর্তীতে ইসলামী সালতানাতে রাজতন্ত্রের অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে উম্মতে মুসলিমাকে বিশাল মুসিবতে নিপতিত করবে। উম্মতে মুসলিমাকে আগত সেই মুসিবত থেকে রক্ষাকল্পে নিজের জানের বাজী লাগাতে প্রস্তুত হয়ে যান নবীজীর দৌহিদ্র মর্দে মুমিন হযরতে হুসাইন রাঃ। যদিও তার এ মতামতের সাথে তার নিকটতম ব্যক্তিবর্গের মাঝে অনেকেই বিরোধীতা করেছেন। যেমন ছোট ভাই মুহাম্মদ বিন আলী রাঃ, বোন জামাতা হযরত উবায়দুল্লাহ বিন জাফর রাঃ হুসাইন রাঃ এর অবস্থানের সাথে একমত ছিলেন না। তাছাড়া মুয়াবিয়া রাঃ এর ইন্তেকালের পূর্বে তিনি যখন ইয়াযিদকে পরবর্তী খলীফা নির্বাচনের বাইয়াত গ্রহণ করছিলেন, তখন হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর রাঃ এবং হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাঃ বিরোধীতা করলেও ইয়াযিদ খলীফা হয়ে যাবার পর তারা তাকে খলীফা হিসেবে মেনে নেন। তার বিরোধীতা করাকে পছন্দ করতেন না।

হুসাইন রদ্বিআল্লাহু তাআলা আনহু কি রাষ্ট্রেদ্রোহী ছিলেন?

ইয়াযিদের শাসন এবং হুসাইন রাঃ এর বাইয়াত হতে অস্বিকৃতি হযরতে হুসাইন রাঃ কি রাষ্ট্রদ্রোহী ছিলেন? এখানে একটি প্রশ্ন থেকে যায়। সেটি হল, ইয়াযিদের শাসনব্যবস্থা কায়েম হয়ে যাবার পর হযরত হুসাইন রাঃ এর বিরোধীতা কি রাষ্ট্রদ্রোহ হিসেবে ধর্তব্য হবে? সত্য কথা হল, হযরত হুসাইন রাঃ এর বিরোধীতার শুরু লগ্ন থেকে শেষ পর্যন্ত যখন রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের দিকে ঘটনা মোড় নিতে থাকে, তখনো তার অবস্থান এতোটাই সতর্ক ও ভারসম্যতার সাথে আঞ্জাম দিয়েছেন যে, তার কার্যকলাপের উপর রাষ্ট্রদ্রোহিতার মত ভয়াবহ অভিযোগ তোলার কোন সুযোগ নেই। এ বিষয়ে সমঝদারীর সাথে চিন্তা করলে বুঝা যায় যে, হযরত হুসাইন রাঃ এর মতামত ও ইজতিহাদ অনুপাতে ইয়াযিদের খেলাফত পূর্ণ প্রতিষ্ঠা লাভ করেনি। কারণ, মুয়াবিয়া রাঃ এর জীবদ্দশায় নেয়া পরবর্তী খলীফা নির্ধারণ বিষয়ক বাইয়াত শুধুমাত্র একটি পরামর্শ ছিল। এর দ্বারা ইয়াযিদের খেলাফত সাব্যস্ত হয়ে যায় না। আর তিনি যেহেতু ইয়াযিদের হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেননি, তাই এখানো খলীফা হিসেবে ইয়াযিদ তার কছে স্বীকৃত হয়নি। এছাড়া কুফা থেকে যে চিঠি আসছিল, তা দ্বারা সাফ জানা যাচ্ছিল যে,

পুরো ইরাকবাসী হযরতে হুসাইন রাঃ এর জন্য অপেক্ষমান। এখনো ইরাকে ইয়াযিদের বাইয়াতে খেলাফত পূর্ণতা পায়নি। তারা কেউ ইয়াযিদের হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেনি। এই দৃষ্টিকোণ থেকে ইয়াযিদ যেহেতু তখনো পূর্ণ খলীফা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেনি, তাই তার বিরোধীতা রাষ্ট্রদ্রোহীতার অন্তর্ভুক্ত হবে না।
যেমন ইতোপূর্বে হযরত উসমান রাঃ এর হত্যার বিচার হবার আগে হযরত আলী রাঃ এর হাতে বাইয়াত হতে অস্বিকৃতি জানিয়েছিলেন আম্মাজান আয়শা রাঃ এবং মুয়াবিয়া রাঃ, তালহা ও যুবায়ের রাঃ। বাইয়াত না হওয়া এবং শামের লোকদের হযরত আলী রাঃ এর বাইয়াত হতে না চাওয়ার ফলে আয়শা রাঃ ও মুয়াবিয়া রাঃ এর বিরোধীতাকে রাষ্ট্রদ্রোহীতা হিসেবে ধরা কঠিন। কারণ, তাদের ইজতিহাদী রায় হিসেবে উসমান রাঃ এর বিচার আগে করা বিষয়ে আলী রাঃ এর বিরোধীতা করাকে তারা রাষ্ট্রদ্রোহীতা মনে করেননি। কারণ, তাদের কাছে তখনো আলী রাঃ এর খিলাফত পূর্ণতা লাভ করেনি। কিন্তু আসল হাকীকত ছিল ভিন্ন। শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে হযরত আলী রাঃ যথার্থ ছিলেন। আর মুয়াবিয়া রাঃ ও আম্মাজান আয়শা রাঃ এর ইজতিহাদী ভুল হয়েছিল। আর মুজতাহিদ ভুল করলে কোন গোনাহ হয় না। বরং ভুল করলেও তারা সওয়াবের অংশীদার হয়ে থাকেন। হযরত হুসাইন রাঃ এর বক্তব্য ও অবস্থান অনুপাতে ইয়াযিদের খেলাফত পূর্ণ হয়নি তখনো। কারণ, ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধান দুই শহর মক্কা ও মদীনার অধিকাংশ লোকেরা ইয়াযিদকে দিল থেকে খলীফা মানতে পারছিল না। আর ইরাকের সংবাদ তিনি চিঠির মাধ্যমে জানতে পারছিলেন। কুফার গভর্ণর হযরত নু'মান বিন বশীর রাঃ ও ইয়াযিদের বিপরীতে হযরত হুসাইন রাঃ কে খলীফা মানতে প্রস্তুত ছিলেন।সেই হিসেবে হযরত হুসাইন রাঃ এর কাছে ইয়াযিদ জোরপূর্বক শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তি হিসেবেই প্রতিয়মান হয়। এ হিসেবে হযরত হুসাইন রাঃ এর কাছে পরিস্কার হয় যে, ১. ইয়াযিদ মুসলমানদের ইচ্ছা ও সিদ্ধান্তকে অগ্রাহ্য করে জোরপূর্বক ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করছে। ২. ইয়াযিদের খেলাফত এখানো পরিপূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। সুতরাং এখনি যদি তা রুখে দেয়া যায়, এবং পূর্বসূরী খোলাফায়ে রাশেদীনের পদ্ধতি অনুসারে রাষ্ট্রনায়ক নির্বাচনের পদ্ধতিকে পুনর্জিবীত করা যায়, তাহলে তা যথার্থ হবে। আর এজন্য চেষ্টা ও মেহনত করাটা রাষ্ট্রদ্রোহীতার অন্তর্ভুক্ত হবে না। যে রাষ্ট্রদ্রোহীতাকে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। এখন প্রতিবাদ প্রতিরোধ করাটা কোন প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রকে ভেঙ্গে ফেলতে চেষ্টা করা নয়, বরং একটি বিভক্ত রাষ্ট্রকে একত্রিত করে খোলাফায়ে রাশেদীনের সোনালী পদ্ধতিতে ফিরিয়ে নেয়ার প্রচেষ্টা মাত্র। এছাড়া হযরত হুসাইন রাঃ এর সামনে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এর ফরমানও ছিল যে, কোন অপছন্দনীয় কাজ দেখলে তা প্রতিহত করতে করতে হবে সাধ্যানুপাতে। প্রথমে হাত দিয়ে, না পারলে জবান দিয়ে, সর্বনিম্ন হলো মনের অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে। হযরত হুসাইন রাঃ এবং হযরত

আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের রাঃ তাই নিজের সাধ্যের সবটুকু দিয়ে তাদের দৃষ্টিতে এ মাকরূহ কার্যক্রমকে বন্ধ করাকে নিজের উপর জরুরী বলে মনে করতে লাগলেন। এজন্য নিজের প্রাণকে উৎস্বর্গ করতেও দ্বিধাবোধ করবেন না।

ওলীদ বিন উতবাকে বরখাস্তকরণ

ওলীদ হযরত হুসাইন রাঃ এবং হযরত আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের রাঃ মক্কা রওনা হয়ে যাবার পর মাসআব বিন আব্দুর রহমান এবং আব্দুল্লাহ বিন মুতী' আলআদয়ী রাঃ কে গ্রেফতার করে জেলে বন্দী করলেন। যারা আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের রাঃ এর সমর্থক ছিলেন। মদীনাবাসী হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর রাঃ এর কাছে আবেদন করলেন যে, যেন প্রশাসন এভাবে কঠোরতা করা থেকে যেন বিরত থাকে। হযরত ইবনে উমর রাঃ পেরেশান হয়ে ওলীদ বিন উতবার সাথে সাক্ষাৎ করেন। বললেন, 'স্বীয় শাসন প্রতিষ্ঠিত রাখতে হকের উপর অটল থাকো, জুলুম করো না। যাদের গ্রেফতার করেছো তারা নির্দোষ। তাদের ছেড়ে দাও'। ওলীদ বিন উতবা ওজর পেশ করল। আমীরুল মু'মিনীন ইয়াযিদের আদেশ এমনটাই। তাই লঙ্ঘন করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। মদীনাবাসী যখন দেখলো যে, আব্দুল্লাহ বিন উমর রাঃ এর মত ব্যক্তিত্ব এর সুপারিশ পর্যন্ত ফিরিয়ে দেয়া হল। তখন তারা জেলখানায় হামলা করে বসে। এর ফলে আব্দুল্লাহ বিন মুতী' মুক্ত হয়ে মক্কায় চলে যান। আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের রাঃ এর সাথে গিয়ে মিলে যান। [আনছাবুল আশরাফ-৫/৩০২] হযরত হুসাইন রাঃ এবং ইবনে যুবায়ের রাঃ এর মদীনা থেকে বের হয়ে যাওয়ায় ইয়াযিদের চিন্তা বেড়ে যায়। উক্ত হযরতদ্বয়ের বাইয়াত নিতে অকৃতকার্য হবার সমস্ত দায়ভার ওলীদ বিন উতবার উপর চাপিয়ে তাকে বরখাস্ত করে দেন। তার স্থলে আমর বিন সাঈদ আলআশদাক কে নিয়োগদান করেন। যে কঠোর স্বভাবের অধিকারী বলে প্রসিদ্ধ ছিল।

আমর বিন সাঈদ আলআশদাক এসেই ঘোষণা দেয় যে, সে যেখানে তারা আশ্রয় নিয়েছেন সেই স্থানে হামলা করবে।কিন্তু তার জন্য হামলা করার সুযোগ ছিল না। কারণ, শাওয়াল মাস নিকটবর্তী। হাজীদের কাফেলা মক্কায় আগমনের অপেক্ষমান। এমতাবস্থায় পবিত্র শহরে পবিত্র মাসে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বংশের উপর হামলা করা কিছুতেই বরদাশত করবে না। তাই ইচ্ছে থাকা সত্বেও আমর বিন সাঈদ হামলা থেকে বিরত থাকে। হজ্বে মওসূম শেষ হওয়া এবং হাজীদের ফিরে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা ছাড়া ইয়াযিদ প্রশাসনের আর কোন উপায় ছিল না।

হুসাইন রদ্বিআল্লাহু তাআলা আনহুর ইরাকে গমনের সংকল্প

হযরত হুসাইন রাঃ ইরাক যাবার সংকল্প কেন করলেন? এই উত্থান পতনের পরিস্থিতি নিয়ে হযরত হুসাইন রাঃ এবং আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের রাঃ এর মাঝে দফায় দফায় পরামর্শ হয়। অবশেষে তারা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, একটি স্থানকে কেন্দ্র বানিয়ে নিজেদের মেহনত চালিয়ে যেতে হবে। কিন্তু কেন্দ্র কোন স্থানকে বানানো হবে? এ বিষয় নিয়ে উভয়ের মাঝে মতভেদ দেখা দেয়। আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের রাঃ এর মত ছিল এই যে, মারকায মক্কাকে বানানো হোক। কারণ, মক্কাই সবচেয়ে নিরাপদ। মক্কা পুরো মুসিলম মিল্লাতের ঈমানী ও রূহানী কেন্দ্রভূমি। মক্কায় যেমন সাহায্যকারী নিজেদের গোত্র কোরাইশরা রয়েছে, তেমনি মুত্তাকী পরহেযগারদের এক বড় জামাতও বিদ্যমান। তাই তিনি চাইলেন যে, হযরত হুসাইন রাঃ ও যেন মক্কাকেই কেন্দ্র হিসেবে গ্রহণ করেন।কিন্তু হযরত হুসাইন রাঃ এর কাছে ইরাক থেকে একের পর এক পত্র এবং প্রতিনিধি দল আসছিল। যারা হযরত হুসাইন রাঃ এক সর্বাত্মক সহযোগিতা করার আশ্বাস দেয়ায় তিনি ইরাক যাবার দিকেই মনস্থির করছিলেন। ইরাকে যাবার পেছনে হুসাইন রাঃ এর প্রথম কারণ এই ছিল যে, আন্দোলনে সাধারণ মানুষের জানমাল হেফাযত করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। হেজাযের তুলনায় ইরাকে তার অনুসারীদের সংখ্যা বেশি থাকায় শক্তিও বেশি থাকবে। ফলে কম ক্ষতির সম্মুখিন হয়ে সফলতার মুখ দেখা সহজ হবে বলেই তিনি মনে করলেন। দ্বিতীয়ত হযরত হুসাইন রাঃ নিজের জানের চেয়ে পবিত্র নগরীর পবিত্রতাকে রক্ষা করাকে বেশি জরুরী মনে করলেন। যে কারণেই হযরত উসমান রাঃ নিজের জানের কুরবানীতো পেশ করেছেন, কিন্তু পবিত্র নগরীতে রক্তপাত করাকে সাপোর্ট করেননি। এ কারণে হযরত আলী রাঃ ও মক্কা মদীনা ছেড়ে কুফাকে রাজধানী বানিয়েছিলেন। হযরত হুসাইন রাঃ জানতেন যে, এখন হজ্জ চলছে বলে তার উপর হামলা করা বন্ধ আছে। কিন্তু হজ্জ শেষ হতেই তার উপর আক্রমন করা হবে। তাই তিনি পবিত্র নগরীকে রক্তপাত থেকে রক্ষা করতে মক্কা ছেড়ে দেয়াকেই প্রাধান্য দিলেন। মক্কায় থাকাকালীন আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের রাঃ কে বললেন, "যদি আমাকে অন্য কোথাও হত্যা করা হয়, তাহলে আমার কোন আপত্তি নেই, কিন্তু আমার কাছে এটা সহনীয় নয় যে, আমার কারণে পবিত্র নগরীর পবিত্রতা বিনষ্ট হোক। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, হযরত হুসাইন রাঃ কুফার লোকদের কৃত অঙ্গিকারভঙ্গের সম্ভাবনা এবং ইয়াযিদ প্রশাসনের কঠোরতার ব্যাপারে ওয়াকিফহাল ছিলেন। যেহেতু ইরাকবাসী তার সাথে গাদ্দারী করতে পারে এ সন্দেহ ছিল। এ কারণেই তিনি ইরাক রওনা হবার বিষয়ে তাড়াহুড়া করেননি। বরং খোঁজখবর নিয়ে ধীরে সুস্থ্যে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন।

নেতৃস্থানীয় এবং মুরুব্বীগণ ইয়াযিদের হাতে কেন বাইয়াত হলেন?

প্রশ্ন হল, যদি ইয়াযিদের খেলাফতলাভ খোলাফায়ে রাশেদীনের তরীকায় নাই হয়ে থাকে, তার কার্যক্রম প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে থাকে, তাহলে সাহাবায়ে কেরাম এবং তাবেয়ীগণের বিরাট জামাত তার হাতে কেন বাইয়াত হয়েছিলেন? বাস্তব কথা হল, তাদের মাঝে একদল হযরত মুয়াবিয়া রাঃ এর দলীল ও ইজতিহাদের সাথে একমত ছিলেন। আর কতক শরীয়তের আরেকটি হুকুম পালনের নিমিত্তে বাইয়াত হন। সেটি হল, "একতা ও ভ্রাতৃত্ব বজায় রাখো। পরস্পর বিভক্ত হয়ো না"। একতার উক্ত হুকুমটি কুরআন ও হাদীসের অনেক স্থানেই উদ্ধৃত হয়েছে। এ গুরুত্বপূর্ণ হুকুমটি পালনের জন্য কিছু কিছু অবস্থায় নিজের অবস্থান থেকে সরে গিয়ে অনিচ্ছাসত্ত্বেও অনুত্তম বস্তুকে গ্রহণ করা হয়ে থাকে। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে নেতৃস্থানীয় সাহাবা ও তাবেয়ীগণ ইয়াযিদের হাতে বাইয়াত গ্রহণ করে উম্মতকে একতাবদ্ধ রাখতে ভূমিকা রাখেন। হামীদ বিন আব্দুর রহমানের এক বর্ণনায় এসেছে যে, ইয়াযিদ খলীফা হবার সময় তিনি একজন সাহাবীর কাছে গেলেন। তখন উক্ত সাহাবী বলেন, "তোমরা বল যে, ইয়াযিদ উম্মতের মাঝে সর্বোত্তম ব্যক্তি নয়, ইলম, ফাকাহাত এবং মর্যাদায় সবার চেয়ে উত্তমও নয়। আমিও একথাই বলি। কিন্তু আল্লাহর কসম! আমি উম্মতে মুহাম্মাদীর একত্রিত থাকাকে তাদের বিভক্ত হয়ে যাওয়ার উপর প্রাধান্য দিয়ে থাকি।

মুরব্বীশ্রেণীর ইয়াযিদের হাতে বাইয়াত হবার আরেকটি কারণ ছিল এই যে, সেসময় ইয়াযিদ বিষয়ে কোন খারাপ ধারণা কারো ছিল না। কারবালার মর্মান্তিক ঘটনা, হাররার ঘটনা এবং কা'বা অবরোধ ইত্যাদির মাধ্যমে তার চরিত্রে যে কালোদাগ অঙ্কিত হয় তাতো প্রকাশ পায় খলীফা হবার পর। কিন্তু খলীফা হবার আগে ইয়াযিদের চারিত্রিক কোন মারত্মক পদস্খলনও সংঘটিত হয়নি। সে ছিল পরীক্ষিত সেনানায়ক। হজ্বের প্রধান ইমামের দায়িত্বপালনকারী। একজন সাহাবীর সন্তান তাবেয়ী, নেক ও মুত্তাকী পরিবারের সন্তান। এইসব গুণাবলীর দিকে তাকিয়ে অনেক সাহাবা ও তাবেয়ীগণ ভালো কিছুই হবে সেই আশায় তার হাতে বাইয়াত গ্রহণ করে নিয়েছিলেন। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমরা শোন ও আনুগত্য প্রকাশ কর, যদিও তোমাদের উপর এমন কোন হাবশীকে আমীর নিযুক্ত করা হয় যার মাথা কিসমিসের মতো। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং-৬৯৩, ইফাবা-৬৬০) এ হাদীসের আলোকে বুঝা যায় যে, যখন কোন খলীফা যেভাবেই হোক যদি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়, তাহলে তাকে মেনে নেয়া উচিত। তার বিরোধীতা করা যাবে না। যদিও সে দেখতে কুৎসিত হয় না কেন। উক্ত হাদীসের উপর আমল হিসেবেও অনেক সাহাবা ও তাবেয়ীগণ ইয়াযিদের হাতে বাইয়াত হওয়াকেই নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশের বাস্তবায়ন মনে করেছেন। তাই তার হাতে বাইয়াত হয়ে গেছেন। আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাঃ এবং আব্দুল্লাহ

বিন উমর রাঃ এর ইয়াযিদের হাতে বাইয়াত ইয়াযিদের প্রতিনিধি যখন আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাঃ এর কাছে বাইয়াত নেবার জন্য মক্কা আসে, তখন তিনি উপস্থিত সবাইকে বলেন, "আল্লাহর কসম! মুয়াবিয়া তার আগের খলীফাদের মত ছিল না। কিন্তু তারপর তারমতও আর কেউ আসবে না। নিশ্চয় ইয়াযিদ তার নেক পরিবারের সন্তান। সুতরাং আপনারা সবাই স্বীয় স্থানে আরাম করে বসে থাকুন। ইয়াযিদের বাইয়াত করে তার আনুগত্ব করুন। তারপর তিনি নিজেও বাইয়াত হন। আনছাবুল আশরাফ-৫/২৯০] হযরত আব্দুল্লাহ উমর রাঃ এর অবস্থান এই ছিল যে, যদি সবাই বাইয়াত হয়ে যায়, তাহলে তিনিও বাইয়াত হয়ে যাবেন। তাই তিনি যখন দেখলেন যে, অধিকাংশরাই বাইয়াত হয়ে গেছেন, তখন তিনিও বাইয়াত হয়ে যান। বুঝা যায় যে, তার এ বাইয়াত মনের টানে ছিল না। সন্তুষ্টচিত্তে ছিল না। বরং সকলে হয়ে গেছেন দেখে বাধ্য হয়ে তিনিও বাইয়াত হয়েছেন। এ কারণেই তিনি তার বাইয়াত হবার সময় বলেন, "যদি এর মাধ্যমে ভালো হয়, তাহলে আমি রাজি, আর যদি ক্ষতি হয়,তাহলে আমরা ধৈর্যধারণ করবো।

খলীফা আব্দুল্লাহ বিন আব্বাসের প্রতি ইয়াযিদের পত্র

হযরত হুসাইন রাঃ মক্কায় অবস্থান করছিলেন। সে সময় আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাঃ এর কাছে ইয়াযিদ একটি পত্র প্রেরণ করে। যার মাধ্যমে বুঝা যায় যে, সে হুসাইন রাঃ এর কার্যক্রম বিষয়ে নজর রাখছিল। তার থেকে বিদ্রোহের আশংকা করছিল। তাই পত্রের মাধ্যমে এ বিষয়ে কড়া হুশিয়ারী প্রদান করে। পত্রে ইয়াযিদ লিখে যে, "হুসাইন রাঃ এর নিকট পূর্ব থেকে লোকজন এসে তাকে খেলাফতের আশা দিচ্ছে। আপনি অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত অভিজ্ঞ মানুষ। যদি হুসাইন রাঃ এমন করেন, তাহলে আত্মীয়তার বন্ধন ছিড়ে যাবে। আপনি বংশের বড় এবং সম্মানিত ব্যক্তি। আপনি তাকে এ বিদ্রোহ থেকে বাঁধা প্রদান করুন।" আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাঃ উত্তরে লিখলেন, "আমার প্রত্যাশা যে, হুসাইন রাঃ এর গমন এমন কোন কাজের জন্য হবে না, যা আপনার জন্য অসন্তুষ্টির কারণ হবে। মোটকথা, দামেশক প্রশাসনের কাছে হুসাইন রাঃ এর বিষয়টি খুবই গুরুত্ববহ ছিল। হুসাইন রাঃ এর যোগাযোগ কুফার জনগণের সাথে হওয়ায় ইয়াযিদের ভয় হয় যে, তারা সম্মিলিতভাবে বিদ্রোহ করে বসবে। এদিকে হযরত হুসাইন রাঃ ভাবলেন যে, ইয়াযিদ ও তার নির্ধারিত গভর্ণরেরা হুসাইন রাঃ এর অবস্থান সম্পর্কে না বুঝেই বিদ্রোহ মনে করে তাদেরকে হত্যা করতে উদ্যত হতে পারে। কারণ, রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলে তাকে হত্যা করার কথা হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। যেমন

ইরশাদ হয়েছে- হযরত আরফাজাহ রাঃ থেকে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহুআলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছন,
এছাড়া নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর একটি হাদীস রয়েছে ,

মুসলিমগণ ঐক্যবদ্ধ থাকা অবস্থায় যে ব্যক্তি তাদের কাজে বাধা দিবে সে যে-ই হোক, তোমরা তাকে তরবারি দিয়ে হত্যা করো। [সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং-৪৭৬২, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-১৮৫২] সে যেই হোক না কেন, যদি সে মুসলমানদের একতার মাঝে বিভক্তি সৃষ্টি করতে আসে, তাহলে তাকে হত্যা করতে বলা হয়েছে। যদিও হযরত হুসাইন রাঃ এর দৃষ্টিতে ইয়াযিদের খেলাফত পূর্ণতা পায়নি। এখনো তার অধীনে উম্মত একতাবদ্ধ হয়নি বলেই প্রতিয়মান হয়েছিল। তাই ইয়াযিদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহকে তিনি একতা বিনষ্টের কারণ হিসেবে গণ্য করেননি। কিন্তু ইয়াযিদ ও তার প্রশাসনের দৃষ্টিতে তা ছিল রাষ্ট্রদ্রোহিতা। তাই তারা যেকোন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে বলে হযরত হুসাইন রাঃ আশংকা করলেন। এ কারণে, সরাসরি ইয়াযিদের সাথে কথা না বলে আগে কুফা গমণ করে নিজেদের শক্তিমত্তা মজবুত করার পর বিষয়টির সূরাহা করতে চেয়েছিলেন।

হযরত হুসাইন রাঃ এর নামে কুফার শিয়াদের পত্র

কুফাবাসী শিয়ারা অসংখ্য চিঠি হযরত হুসাইন রাঃ এর কাছে প্রেরণ করে।শিয়াদের প্রকাশিত শোকার্তের দীর্ঘশ্বাস এর মাঝে আসছেঃ- "আর কুফার জনগণের বিষয়ে, যখন তারা মুয়াবিয়ার মৃত্যু সংবাদ পেলো তারা ইয়াযিদ সম্পর্কে খারাপ মন্তব্য করতে শুরু করল। এছাড়া তারা জানতে পেরেছিল যে, ইমাম হুসাইন (আ.) ইয়াযীদের প্রতি আনুগত্যের শপথ করতে অস্বিকার করেছেন এবং মক্কায় চলে গিয়েছেন। আর আব্দুল্লাহ বিন যুবাইরও মক্কায় পালিয়ে গেছে তার সাথে এবং তার সাথে এবং তার সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। ইমামের শিয়ারা (অনুসারীরা) সুলাইমান বিন সুরাদ খুযাইর বাড়িতে জড়ো হয় মুয়াবিয়ার মৃত্যু নিয়ে আলোচনা করতে এবং আল্লাহর প্রশংসা এবং তাসবীহ করতে। সুলাইমান উঠে দাঁড়ালেন এবং বললেন, 'মুয়াবিয়ার মৃত্যু হয়েছে এবং ইমাম হুসাইন (আ.) ইয়াযীদের প্রতি আনুগত্যের শপথ নিতে অস্বীকার করেছেন ও মক্কায় চলে গিয়েছেন। তোমরা তার ও তার বাবার শিয়া (অনুসারী)। তাই যদি তোমরা তাকে সাহায্য কতে চাও ও তার শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে করতে চাও তাকে চিঠি লিখো এবং তাকে এ বিষয়ে জানাও। কিন্তু যদি তোমরা ভয় পাও যে তোমরা ঢিলেমী করবে এবং পিছু হটবে তাহলে তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করো না (তাকে এখানে আমন্ত্রণ

জানিয়ে)।' প্রত্যেকেই ঐক্যবদ্ধভাবে শপথ করলো যে, তারা তাকে সাহায্য করবে এবং তার শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে তার আদেশে এবং তাদের জীবনকে এগিয়ে দিবে কুরবান করতে। যখন সুলাইমান তা শুনলেন, তিনি তাদেরকে আহবান জানালেন ইমামকে চিঠি লেখার জন্য এবং তারা লিখলো। এরপর তারা অসংখ্য চিঠি হযরত হুসাইন রাঃ এর কাছে প্রেরণ করে। যার মূল বক্তব্য ছিল-পুরো ইরাক ইয়াযিদের নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত। শুধু কুফার মাঝেই এক লাখ অস্ত্রধারী লোক হুসাইন রাঃ এর সহযোগিতায় প্রস্তুত। [তারীখে তাবারী-৫/৩৯১) শুধু তা'ই নয়, স্থানীয়রা ইয়াযিদ নির্ধারিত কুফার গভর্ণর নু'মান বিন বশীর রাঃ এ পিছনে জুমআর নামায পড়াও ছেড়ে দিয়েছে। লোকেরা হুসাইন রাঃ এর অনুরক্ত এবং তাকে ছাড়া কারো উপর ভরসা করছে না। [তারীখে তাবারী-৫/৩৪৭) এরকম অসংখ্য পত্র লিখে হযরত হুসাইন রাঃ কে কুফায় আসার জন্য প্রলুব্ধ করছিল শিয়ারা। শুধুমাত্র চিঠি পাঠিয়েই ক্ষান্ত থাকেনি কুফাবাসী। পরপর চিঠির সাথে সাথে প্রতিনিধিদলও প্রেরণ করছিল হযরত হুসাইন রাঃ কে কুফায় আগমনের প্রতি উদ্বুদ্ধ করার জন্য। যেমন শিয়াদের লিখিত বইয়ের মাঝে এসেছে- "তারা এ চিঠি দিলো উবায়দুল্লাহ বিন মুসমে হামাদানী এবং আব্দুল্লাহ বিন ওয়াল তাইমিকে এবং তাদেরকে দ্রুত যেতে বলল। তারা দ্রুত গেলো যতক্ষণ না তারা দশই রমযান মক্কাতে পৌঁছালো। এরপর কুফার লোকেরা দুদিন অপেক্ষা করলো এবং কায়েস বিন মুসাহহার সাইদাউই এবং আব্দুর রহমান বিন আব্দুল্লাহ বিন শাদ্দাদ আরহাবি এবং আম্মারাহ বিন আব্দুল্লাহ সালুলিকে আবার পাঠালো একশত পঞ্চাশটি চিঠি দিয়ে যা এক, দুই, তিন অথবা চারজন লিখেছিলো। এরপর আবার দু'দিন পর তারা হানি বিন হানি সাবেঈ এবং সাঈদ বিন আব্দুদুল্লাহ হানাফিকে দিয়ে একটি চিঠি পাঠালো যার বিষয়বস্তু ছিল এরকম: 'আল্লাহর নামে যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু, সর্বশ্রেষ্ঠ করুণাময়। হোসেইন বিন আলী (আ.) এর প্রতি তার অনুসারীদের, বিশ্বাসীদের এবং মুসলমানদের পক্ষ থেকে। লোকজন আপনার জন্য অপেক্ষা করছে এবং আর কোন মত পোষণ করবেন না, তাই দ্রুত আসুন, দ্রুত আসুন। আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক'। আরেকটি চিঠি লিখেছিলো শাবাস বিন রাবঈ, হাজ্জার বিন আবজার আজালি, ইয়াযিদ বিন হুরেইস বিন রুয়েইম শাইবানি, উরওয়া বিন কায়েস আহমাসি, আমর বিন হাজ্জার যুবাইদি এবং মুহাম্মদ বিন আমর তামিমি, যার বিষয় ছিলো এরকম: 'আম্মা বাআদ, বাগানগুলো সবুজ রং ধারণ করেছে এবং ফলগুলো পেকেছে। যদি আপনি চান, এখানে আসতে পারেন, সেনাদল আপনাকে রক্ষায় প্রস্তুত'।" [শিয়াদের লিখিত 'শোকার্তের দীর্ঘশ্বাস-১ম, পৃষ্ঠা-৬২] উপরোক্ত পত্রাবালীর বিবরণ এবং প্রতিনিধিদলের বক্তব্য জানাচ্ছিল যে, হুসাইন রাঃ দ্রুত ইরাক এসে পরিস্থিতি শামাল না দিলে পুরো ইরাকে ব্যাপক হত্যাকান্ড- শুরু হয়ে যাবে। কারণ, এখানকার অপরিপক্ক বুদ্ধির অধিকারীরা অধৈর্য হয়ে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বসবে। ফলে রক্তের বন্যা বইবে পুরো ইরাক জোরে।

হযরত হুসাইন রাঃ স্বীয় পিতার মত চিন্তা করলেন যে, গোঁয়ার টাইপের মুর্খ লোকদের দূরে ঠেলে না দিয়ে তাদের কাছে টেনে বুঝিয়ে হক পথে রাখাটাই অধিক উপযোগী। যারা পাগলপাড়া হয়ে তাকে কাছে ডাকছে। তাদের নেতৃত্ব দেবার জন্য উদাত্ব আহবান করছে। যদি তাদেরকে আপন অবস্থায় ছেড়ে দেয়া হয়, তাহলে নিজের কম বুদ্ধির কারণে অনর্থক রক্তক্ষয়ী কোন সংঘর্ষের জন্ম দিতে পারে। তাই তাদের নেতৃত্ব দিয়ে তাদেরকে একতাবদ্ধ করে কম ক্ষতির মাধ্যমে উদ্দেশ্য হাসিল করা সম্ভপর হবে বলে আশা করা যায়। এ কারণেই তিনি বিপদকে মাথায় তুলে নিয়ে ইরাকে যাওয়াই উপযোগী মনে করলেন। তিনি আশাবাদী ছিলেন যে, ইরাকে আসলে, সেখানকার জনগণকে নিয়ে তার নেতৃত্বে একটি নতুন শক্তির উত্থান হবে। একদিকে ইরাকের বিশাল জনগোষ্ঠি অপরদিকে হেজাজে আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের রাঃ এর নেতৃত্বে জনসাধারণের বিরাট জামাত। দুইদিক থেকেই বিশাল জনতার একতবদ্ধ অবস্থান দেখে ঘাবরে গিয়ে ইয়াযিদ প্রশাসন হয়তো তাদের রাষ্ট্রনীতির পদ্ধতি পরিবর্তন করে খোলাফায়ে রাশেদীনের তরীকায় রাষ্ট্র পরিচালনা পদ্ধতিতে ফিরে যেতে বাধ্য হবে। তাহলে কোন প্রকার রক্তপাত ছাড়াই আমাদের উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়ে যাবে। আর যদি ইয়াযিদ প্রশাসন তা না মানে, তবুও এ সম্মিলিত শক্তি কম ক্ষতির সম্মুখিন হয়েই ইয়াযিদ বাহিনীর উপর বিজয় লাভ করে ফেলবে। ফলে অল্প ক্ষতির মাধ্যমে বড় উপকার অর্জিত হবে বলে দৃঢ় আশা করা যায়। কুফায় কুফাবাসীর এতো পত্র, এতো আহবানের পরও হযরত হুসাইন রাঃ তাড়াহুড়া করেননি। ইরাকী লোকদের পত্র ও প্রতিনিধিদলের বক্তব্য পুরাপুরি বিশ্বাস করেননি। বরং সত্যি যাচাই করার জন্য তিনি তার চাচাতো ভাই মুসলিম বিন আকীলকে প্রেরণ করে পরিস্থিতি সম্পর্কে সরেজমিন জানতে চান। তাই কুফীদের কথার উপর ভরসা করে নিজে প্রথমে না গিয়ে মুসলিম বিন আকীলকে পাঠানোকে নিরাপদ মনে করলেন। শিয়া রাবী আবু মিখনাফ এর বর্ণনা হল, হুসাইন মুসলিম বিন আকীলের মাধ্যমে কুফাবাসীর কাছে এ পয়গাম পাঠান যে, 'হুসাইন বিন আলীর পক্ষ থেকে আহলে ঈমান ও মুসলমানদের প্রতি! হানী এবং সাঈদ আপনাদের পত্র আমার কাছে এনেছে। আপনাদের দূতদের মাঝে এ দুইজন সবার শেষে আসছে। যা কিছু হযরতরা লিখছেন যে, "আমাদের নেতৃত্ব দেবার কেউ নাই। আপনি আসুন। হয়তো আপনার মাধ্যমে হক ও হিদায়াতের আল্লাহ তাআলা আমাদের একত্র করে দিবেন"। এসব জেনে আমি আমার চাচাতো ভাই,যার উপর আমার আস্থা আছে। আর তিনি আমার পরিবারেরও অন্তর্ভুক্ত। তাকে আপনাদের কাছে পাঠালাম। আমি তাকে বলেছি যে, তিনি যেন আপনাদের অবস্থা এবং সবার রায় আমাকে পত্র লিখে পাঠায়। যদি তার পত্র দ্বারা একথা প্রমাণিত হয়ে যায় যে, আপনাদের দলের সংখ্যা এবং আপনাদের জ্ঞানী গুণী ব্যক্তিরা একথার উপর একমত, যে বিষয়ে আপনারা আমার কাছে পত্র লিখছেন এবং আমার কাছে দূত পাঠিয়েছেন। তাহলে খুব দ্রুতই আমি আপনাদের কাছে আসবো ইনশাআল্লাহ।

[তারীখে তাবারী-৫/৩৫৩] এ আখেরী পত্র দ্বারাও বুঝা যায় যে, হযরত হুসাইন রাঃ কোন যুদ্ধ করতে চাননি। কেবল কুফাবাসীর একতা ও সমর্থন চেয়েছেন।

মুসলিম বিন আকীলের কুফায় গমন

হযরত মুসলিম বিন আকীল কুফায় আসলেন। কুফীরা বিশাল শো ডাউনের মাধ্যমে তাকে বরণ করেন। মুসলিম বিন আকীলের হাতে অল্প কয়েক দিনে প্রায় আঠারো হাজার লোক হুসাইন রাঃ এর নামে বাইয়াত হয়। যাতে করে মুসলিম বিন আকীল বুঝেন যে, কুফীরা পত্রে যা লিখেছে এবং লোক পাঠিয়ে যা কিছু বলছে, এ সব কিছুই সত্য। তারা হযরত হুসাইন রাঃ এর জন্য জান দিতে প্রস্তুত। আর কুফায় এখানো ইয়াযিদের খেলাফত পূর্ণতা পায়নি। অধিকাংশ লোক ইয়াযিদের খেলাফতের বিরোধী।কিন্তু আসলে এসবই ছিল তাদের প্রতারণা। তাদের মূল মাকসাদ ছিল যেন হযরতে হুসাইন রাঃ কুফায় আসেন। আর তারা তাদের মাকসাদ যা করতে পারে। কুফায় তখন ইয়াযিদের খেলাফত মজবুত হয়ে গিয়েছিল। কুফায় তখন ইয়াযিদের গভর্নর ছিল হযরত নুমান বিন বশীর রাঃ। তিনি মুসলিম বিন আকীলের আগমণ এবং বাইয়াত সম্পর্কিত বিষয় জানার পরও কোন এ্যাকশনে যাননি। এতে কেউ কেউ আপত্তি তুললে নুমান বিন বাশীর রাঃ বলেন, আল্লাহর আনুগত্যে থেকে দুর্বল থাকা আমার পছন্দ, আল্লাহর নাফরমানীতে শক্তিশালী হবার চেয়ে। (তারীখে তাবারী-৫/৩৪৮] তিনি মুসলিম বিন আকীলের সাথীদের বলেন, 'আমি সন্দেহের বশে তোমাদের গ্রেফতার করবো না। তবে যদি একথা জানতে পারি যে, তোমরা খলীফার বাইয়াত ভেঙ্গেছো, এবং রাষ্ট্রদ্রোহ করছো, তাহলে আল্লাহর কসম! আমি তলোয়ার ব্যবহার করতে কুণ্ঠিত হবো না'। [তারীখে তাবারী-৫/৩৪৮] একজন গভর্নর হিসেবে নুমান বিন বশীর রাঃ নিশ্চয় মুসলিম বিন আকীলের যাবতীয় কার্যক্রম নজরে রাখছিলেন। কিন্তু তারপরও মুসলিম বিন আকীলকে গ্রেফতার না করা একথাই প্রমাণ করে যে, হযরত নুমান বিন বশীর রাঃ এর কাছে মুসলিম বিন আকীলের কার্যক্রমকে রাষ্ট্রদ্রোহ বলে মনে হয়নি।যদি এমন কিছু হতো,তাহলে তিনি অবশ্যই এ্যাকশনে যেতেন। মুসলিম বিন আকীলের আশ্বাসমূলক পত্র প্রেরণ, মুসলিম বিন আকীল কুফাবাসীর প্রতারণা বুঝতে না পেরে তাদের বাহ্যিক উচ্ছ্বাস-উদ্দীপনা ও সহযোগিতা দেখে খুশি খুশি পত্র প্রেরণ করেন হযরত হুসাইন রাঃ এর কাছে। যাতে তিনি জানান যে, বার হাজার লোক আমার হাতে বাইয়াত হয়ে গেছে। প্রচুর লোক বাইয়াত হতে আসছে। আপনি দ্রুত কুফায় চলে আসুন। এক বর্ণনায় আসছে যে, তিনি লিখেন, সমস্ত কুফাবাসী

আপনার সাথে আছে। আপনি আমার চিঠি পেয়েই চলে আসুন। এ পত্র ৬০ হিজরীর জিলকদ মাসের এগার তারিখে পাঠানো হয়।

হযরত হুসাইন রাঃ এর কুফায় যাবার প্রস্তুতিঃ

হযরত হুসাইন রাঃ এর কাছে মুসলিম বিন আকীলের পত্র আসতেই তিনি কুফায় রওনার প্রস্তুতি নিতে শুরু করেন। এ সফরে তার পরিবারের অল্প কিছু ব্যক্তি ছাড়া আর কোন মুসলমান এটিকে সমর্থন করেননি। বরং বড় সাহাবাগণ এবং তার নিকটাত্মীয়গণ যথাসম্ভব কুফায় যেতে বারণ করতে থাকেন। হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর রাঃ, হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাঃ খুব বুঝালেন যে, মক্কার বাইরে যাবেন না। কুফায় যাবার ইচ্ছে পরিত্যাগ করুন। এটাকে একটা ষড়যন্ত্র মনে হয়। যেভাবে আপনার পিতা আলী রাঃ কে ওরা হত্যা করেছে কুফাবাসী। ওরা আপনার বাবা ও ভাই হাসান রাঃ এর সাথে গাদ্দারী করেছে ওরা। এমনিভাবে আপনার সাথেও এরা গাদ্দারী করবে। তারা উভয়ে খুব বুঝালেন। যেভাবে তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান গনী রাঃ কে তার পরিবারের সামনে হত্যা করা হয়েছে। না জানি ওরাও আপনাকে আপনার পরিবারের সামনেই হত্যা করে। আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাঃ একথা বলতে থাকেন যে, যদি আমি বুঝতাম যে, আমি বাঁধা দিলে তুমি যাবে না, তাহলে আমি তোমার মাথা ও দাড়ি ধরে বাঁধা দিতাম। তারপর হযরত ইবনে আব্বাস রাঃ দৌড়াতে দৌড়াতে হযরত হুসাইন রাঃ এর ঘোড়ার লাগাম ধরে বললেন, যদি আপনি যেতেই চান, তাহলে অন্তত সন্তান সন্তুতি এবং পরিবারের সদস্যদের রেখে যান। তাদের এ বিপদের মুখে নিয়ে যাবেন না। হুসাইন রাঃ এর ভাই মুহাম্মদ বিন আলী হানাফিয়্যাহ ও সর্বোচ্চ চেষ্টা করবেন ভাইকে সফরে বাঁধা দিতে। হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাঃ হযরত হুসাইন রাঃ কে বুঝাতে বলেন, আল্লাহকে ভয় কর। নিজের ঘরে বসে থাকো। নিজের ইমাম ইয়াযিদের বিরুদ্ধে যেও না। হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ রাঃ বলেন,আমি হুসাইন রাঃ কে এ বিষয়ে কথা বলে বললাম, তুমি আল্লাহকে ভয় কর। লোকদের পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত করিও না। হুসাইন রাঃ এর চাচাতো ভাই এবং বোন জামাতা হযরত আব্দুল্লাহ বিন জাফর রাঃ সর্বোচ্চ চেষ্টা করেন হযরত হুসাইন রাঃ কে কুফায় যেতে বাঁধা দিতে। কিন্তু তার কথাও তিনি মানলেন না। আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের রাঃ হুসাইন রাঃ কে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কোথায় যাচ্ছো, তুমি কি এমন এক সম্প্রদায়ের কাছে যাচ্ছো, যারা তোমার পিতাকে হত্যা করেছে আর তোমার ভাইকে অপবাদ দিয়েছে। এই সকল আত্মীয় স্বজন, সাহাবাগণ সকলেই হযরতে হুসাইন রাঃ কে কখনো কোমল সুরে, কেঁদে কেঁদে, কখনো কঠোরতার সাথে বাঁধা দেবার চেষ্টা করেন। কুফার লোকেরা ধোঁকাবাজ।

এরা প্রতারক। ওদের চিঠির বক্তব্য আর বাস্তবতা এক নয়। তাই সেখানে যাওয়া নিজেকে বিপদের মধ্যে ঠেলে দেয়া। তাছাড় ইয়াযিদের খেলাফত পূর্ণতা পেয়েছে। সুতরাং এখন ভিন্ন কিছু চিন্তা করা মানে রাষ্ট্রদ্রোহীতা হবে। তাই সেখানে যাওয়া কিছুতেই উচিত হবে না। কিন্তু হুসাইন বিন আলী রাঃ নিচের সিদ্ধান্তে অনড় রইলেন। পরিবারসহ তিনি জিলহজ্ব মাসের ৮ তারিখ মক্কা থেকে কুফার উদ্দেশ্যে রওনা হন। তবে রাজেহ কওল হল, হযরত হুসাইন রাঃ এর আগেই রওনা হন। সঙ্গী ছিলেন পরিবারের ৮২ সদস্য এবং কুফার ৬০ জন শিয়া। তিনি যাবার সময় সাথে কুফাবাসী শিয়াদের লিখিত পত্রও নিয়ে নেন। মক্কা থেকে কারবালার দূরত্ব ত্রিশ মনজিল। সেই জামানায় মনজিল ছাড়া এদিক সেদিক বিরতি দেয়া হতো না। সেই হিসেবে কাফেলা প্রতিদিন এক মনজিল সফর করতো। এভাবে সফর করে দশে মুহাররমে কারবালা প্রান্তরে পৌঁছে যান। হযরত হুসাইন রাঃ এতো বাঁধার পরও কেন থামলেন না? এতো বড় বড় ব্যক্তিত্ব, মুখলিস স্বজন ও প্রিয়জনদের এতো বাঁধার পরও কেন হযরতে হুসাইন রাঃ নিজের সিদ্ধান্তে অটল রইলেন? তিনি কি ক্ষমতার লোভী ছিলেন? নাউজুবিল্লাহ! অবশ্যই নয়। তিনি একথা বুঝতে পারছিলেন যে, কুফা যাওয়া ছাড়া এ সমস্যার সমাধান হবে না। দ্বিতীয়ত মক্কার গভর্ণরের পক্ষ থেকে এ শংকা ছিল যে, সুযোগ পেলেই জোরপূর্বক বাইয়াত গ্রহণ করাতে চাইবে ইয়াযিদের নামে। বাইয়াত নিতে চাইলে যে মতানৈক্য তৈরী হবে এতে করে পবিত্র শহরে রক্তপাতের সম্ভাবনা আছে। তবে অন্যান্য সাথীদের কথামত বাইয়াত নিয়ে ঘরে থাকলে অবশ্যই নিরাপত্তা পাওয়া যেতো। শরীয়তে এর সুযোগও ছিল। কিন্তু তার মত ব্যক্তিত্বের জন্য হাত গুটিয়ে বসে থাকা শোভা পায়নি। তাই তার কাছে ইজতিহাদ অনুপাতে দৃঢ়তার উপর অটল থাকাকে যথার্থ বলে মনে হয়েছে। যাতে করে ইসলামী হুকুমতের উপর এক খান্দানের প্রতিপত্তির রেওয়াজ বন্ধ হয়। এ কারণেই তিনি শত বাঁধা বিপত্তির পরও নিজের সিদ্ধান্তে অটল থেকে কুফা যাবার পক্ষেই অনড় থাকেন।

কুফায় অবস্থার পরিবর্তন ও আব্দুল্লাহ বিন যিয়াদের নিয়োগ ও মুসলিম বিন আকিলের মৃত্যু

মুসলিম বিন আকীলের পত্র পৌঁছতে তিন চার সপ্তাহ লেগেছে। এর মাঝে কুফার অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। যে ব্যাপারে হযরত হুসাইন রাঃ কিছুই জানতেন না। ঘটনা হল, কুফার কঠোরমনস্ক লোকেরা গভর্ণর মুসলিম বিন আকীল বিষয়ে নুমান বিন বশীর রাঃ এর কোমল আচরণ পছন্দ করছিল না। প্রথমে তাকে নানা কথা বলে ক্ষুব্ধ করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু নুমান বিন বশীরের অবিচলতা থেকে তারা ইয়াযিদের কাছে এ বিষয়ে নালিশ দিয়ে চিঠি

পাঠায়। আজগুবি ও বানোয়াট কথা মিশ্রিত পত্রে ইয়াযিদকে ক্ষিপ্ত করা। যাতে করে তিনি নুমানকে বরখাস্ত করেন। প্রথম পত্রটি পাঠায় এক খৃষ্টান। যার ব্যাপারে ইয়াযিদ ছিল বেখবর। ইয়াযিদ ওদের কথায় প্রলুব্ধ হয়ে নুমান বিন বশীরের মত বয়োজেষ্ঠ এবং অভিজ্ঞতা সম্পন্ন বুযুর্গ ব্যক্তিকে বরখাস্ত করে দেয়। বসরার গভর্ণর উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদকে বসরার সাথে কুফার নতুন গভর্ণর হিসেবে দায়িত্ব প্রদান করে। উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদ ছিল কঠোর হৃদয়ের অধিকারী এবং দায়িত্ব পালনে ছিল কট্টর। উবায়দুল্লাহ দায়িত্ব পেতেই বসরা থেকে কুফায় চলে আসে। এ সময় মুসলিম বিন আকীল শহরের এক সরকারী আমীর হানী বিন উরওয়াহ এর ঘরে ছিলেন। উবায়দুল্লাহ গোয়েন্দা মারফত এ সংবাদ জানতেই হানী বিন উরওয়াহকে ডেকে পাঠান। জিজ্ঞাসাবাদে তিনি মুসলিম বিন আকীল কোথায় তা বলতে অস্বিকৃতি জানান। এতে উবায়দুল্লাহ ক্ষীপ্ত হয়ে তাকে জেলে বন্দী করেন। মুসলিম বিন আকীলও একটি মারাত্মক ভুল করে বসেন। যার ফলে পুরো ঘটনাই পাল্টে যায়। তিনি তার মেজবান হানী বিন উরওয়াহকে জেল থেকে উদ্ধার করতে অস্ত্রসহ চার হাজার লোক নিয়ে ময়দানে নেমে আসেন। যখন এ বিশাল বাহিনী নিয়ে গভর্ণরী ভবনের দিকে রওনা হন তখন শুরুতে উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদ ভয় পেয়ে যায়। কিন্তু দ্রুতই কুফার পুরানো প্রতারণার অভ্যাস প্রকাশ পেয়ে যায়। মুসলিম বিন আকীল যখন আক্রমণ করতে অগ্রসর হচ্ছিলেন তখন একে একে তার সাথে শরীক কুফী শিয়ারা সটকে পড়তে শুরু করে। মা তার ছেলের কাছে, বোন তার ভাইয়ের কাছে এসে বলতে লাগল, বাড়িতে ফিরে চল। লোকেরা তোমাদের বাঁধা দিবে। তদ্রুপ পিতা পুত্রকে এবং ভাই ভাইকে বলতে লাগল, কাল যখন শামের ফৌজ এসে পৌঁছবে তখন তুমি কিভাবে তাদের হাত থেকে নিস্তার পাবে? তখন লোকেরা মুসলিম বিন আকীলকে অসহায় অবস্থায় রেখে একে একে তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সরে পড়ল এবং দেখা গেল তার সাথে পাচশ যোদ্ধা বাকি আছে। এরপর তাদের সংখ্যা হ্রাস পেয়ে তিনশ" তারপর ত্রিশে দাঁড়াল। তিনি তাদেরকে নিয়ে মাগরিব নামায পড়লেন এবং আবওয়াবে কিন্দা অভিমুখী হলেন। আর সেখান থেকে দশজন নিয়ে বের হলেন। তারপর এরাও সটকে পড়ল। তখন তিনি সম্পূর্ণ একাকী হয়ে পড়লেন। তার সাথে না থাকলো পথ দেখানোর মত কেউ, কিংবা অন্তরঙ্গতা দান করার মত কেউ, কিংবা নিজ গৃহে আশ্রয় দান করার মত কেউ। তখন তিনি অজানা গন্তব্যের পথে বেরিয়ে পড়লেন। আর এদিকে অন্ধকার ঘনীভূত হয়ে আসছিল। আর তিনি উদ্দেশ্যহীনভাবে একাকী রাস্তায় পথ চলছিলেন। এভাবে তিনি এক গৃহদ্বারে এসে উপস্থিত হলেন। করাঘাত করলে ত্বওয়া নামক এক স্ত্রীলোক বের হল, আর সে ছিল আল আশআছ বিন কায়েশের সন্তান জন্মদানকারিণী বাদী। তিনি পানি চাইলেন। পানি পান করে নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন, হে আল্লাহর বান্দী! এই শহরে আমার কোন বাড়ি ঘর কিংবা স্বজন পরিজন কেউ নেই। তোমার কি আমার প্রতি একটু সদাচার ও অনুগ্রহ করার সুযোগ

আছে? যার পুরস্কার আমি পরে তোমাকে দিবো। কুফার লোকেরা আমাকে ধোকা দিয়েছে। আমার সাথে মিথ্যা বলেছে। তখন উক্ত বাদী নিজ গৃহে মুসলিমকে আশ্রয় দেন। নিরাপদ ঘরে থাকতে দেন। ত্বওয়ার ছেলে এসে যখন বিষয়টি জানল। তখন পরদিন সকালে উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদ পর্যন্ত এ খবর জানিয়ে দিল। উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদ মুসলিম বিন আকীলকে পাকরাও করে নির্মমভাবে হত্যা করে লাশ ছাদ থেকে ফেলে দেয়। হানী বিন উরওয়াকেও হত্যা করে।

উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদের নিকট মারওয়ান ও ইয়াযিদের পত্রঃ

ইয়াযিদের কাছে হুসাইন রাঃ এর রওনার সংবাদ ও মারওয়ানের পত্র হেজাজের গভর্ণর আমর বিন সাঈদ হযরত হুসাইন রাঃ এর রওনা হতেই দারুল খিলাফাহ দামেশকে ও কুফায় সংবাদ দিয়ে লোক পাঠিয়ে দেন। তিনি উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদকে লেখেন যে, হুসাইন রাঃ তোমার দিকে আসছে। মারওয়ান বিন হাকামও উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদের কাছে এ সংবাদ পাঠান। তবে সাথে সাথে পত্রযুগে লিখে পাঠান যে, হুসাইন রাঃ। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মেয়ে ফাতিমা রাঃ এর ছেলে। আল্লাহর কসম! আমাদের কাছে হুসাইন রাঃ এর চেয়ে প্রিয় কেউ নাই। খবরদার। জোশের বশে এমন কিছু করে বসো না, যে কাজের কোন ক্ষতিপূরণ করা না যায়। আর লোকদের তা ভুলানো না যায়। মারওয়ান বিন হাকামের উক্ত পত্র দ্বারা বুঝা যায় যে, বনু উমাইয়ার জ্ঞানী গুণী লোকেরা হযরত হুসাইন রাঃ কে সম্মান ও ইজ্জত করতো। কিন্তু আফসোস হল, উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদ এসব জ্ঞানী ও সমঝদার ব্যক্তিদের পরামর্শ কানে নেয়নি। বড়দের সম্মান করা তার আদতের মাঝেই ছিল না। সে ছিল সৈনিকের ছাচে গড়া এক যন্ত্রমানব। মারওয়ানের মত বয়োজেষ্ঠ্য আমীরের কথার কোন গুরুত্বও তার কাছে ছিল না। উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদের প্রতি ইয়াযিদের পত্র সে সময় ইয়াযিদ উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদের কাছে ফরমান পাঠায়। তাতে লিখে যে, আমার কাছে সংবাদ এসেছে যে, হুসাইন রাঃ কুফার দিকে আসছেন। হুসাইন রাঃ এর বিষয়ে সব সময়ের মাঝে তোমার সময়টা, সকল শহরের মাঝে তোমার শহর, সকল গভর্ণরদের মাঝে তুমিই বড় পরীক্ষার সম্মুখীন। এমন পরীক্ষা পতিত হয়েই লোকেরা উন্নতি অর্জন করে অথবা গোলামদের মত লাঞ্ছিত হয়ে যায়। মুসলিম বিন আকীলকে হত্যা করায় সাবাশী দিয়ে ইয়াযিদ লিখেন: গোয়েন্দা এবং সশস্ত্র পাহারাদারদের সতর্ক রাখো। যাদেরই সন্দেহ হয় গ্রেফতার করো। যাদের উপর অভিযোগ আছে তাদের পাকড়াও করো। কিন্তু হত্যা কেবল তাকেই করবে, যে তোমার সাথে যুদ্ধ করে। আর আমাকে ঘটমান সকল কিছু জানাতে থাকবে।

ইয়াযিদের উক্ত পত্র প্রমাণ করে যে, ইয়াযিদ হযরত হুসাইন রাঃ এর কাফেলায় স্বপ্রণোদিত হয়ে কোন প্রকার ধর-পাকড় করতে আদেশ দেননি। বরং যদি অভিযোগ পাওয়া যায়, বা সন্দেহযুক্ত কাজ করে তাহলেই কেবল পাকড়াও করবে। আর তারা যুদ্ধ না করলে তাদের সাথে হত্যার মত কাজ না করতেও নির্দেশ প্রদান করা হয়। ইয়াযিদ হয়তো ইবনে যিয়াদকে এতটুকু বলাই যথেষ্ট মনে করেছে। অথচ ইবনে যিয়াদের মত পাথর দিলের মানুষের জন্য এতটুকু বলা যথার্থ ছিল না। ইয়াযিদের উচিত ছিল একথা জানানো যে, যদি খারাপ কিছুর সম্ভাবনা হয়, তাহলে যেন হযরত হুসাইন রাঃ কে নিরাপত্তার সাথে তার কাছে দামেশকে পাঠিয়ে দেয়। কিন্তু এভাবে স্পষ্ট কিছু না বলা ইয়াযিদের অপূরণীয় ভুল বলেই প্রতীয়মান হয়েছে।

কুফার অবস্থা সম্পর্কে হযরত হুসাইন রাঃ কে সম্পূর্ণ বেখবরঃ

মুসলিম বিন আকীলকে হত্যা করা পর উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদের প্রথম প্রচেষ্টা এই ছিল যে, কুফার অবস্থা সম্পর্কে হযরত হুসাইন রাঃ কে সম্পূর্ণ বেখবর রাখা। এ লক্ষ্যে সে কুফা থেকে বসরা পর্যন্ত এবং শাম পর্যন্ত কড়া মূল রাস্তাগুলোতে এতোটাই কড়া পাহারা বসায় যে, প্রায় এক মাস জুড়ে হযরত হুসাইন রাঃ পর্যন্ত কুফার খবর জানাতে যেতে এ এলাকা অতিক্রম করতে পারেনি। আরব থেকে আসা কেউ যাচাই বাছাই ছাড়া এ এলাকায় ঢুকতে পারেনি। মুসলিম বিন আকীলকে জিলহজ্ব মাসের ৮ তারিখ শহীদ করা হয়। এর কয়েকদিন আগেই হযরত হুসাইন রাঃ কুফার উদ্দেশ্যে মক্কা থেকে বের হয়ে পড়েন। তার এটা জানা ছিল না যে, কুফার গভর্ণরের আসনে এখন কোমল হৃদয়ের অধিকারী নুমান বিন বশীর রাঃ নয়, বরং পাথর দিলের অধিকারী যন্ত্রমানব উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদ বসে আছে। যদি এতোটা কড়া পাহারা না হতো, তাহলে হয়তো মক্কার সীমানা পাড় হবার আগেই হুসাইন রাঃ এর কাছে কুফার প্রকৃত অবস্থা জানা হয়ে যেতো। কিন্তু কড়া চেকিং এর কারণে কেউ এ সংবাদ জান্নাতের সর্দারের কানে পৌঁছাতে পারেনি। ফলে তিনি তার কাফেলা নিয়ে আগে বাড়তে লাগলেন। [তারীখে তাবারী-৫/৩৯২]

মুসলিম বিন আকিলের হত্যার সংবাদ

ইরাকের সীমান্তের কাছে এসে হুসাইন রাঃ সংবাদ পান যে, মুসলিম বিন আকীলকে হত্যা করা হয়েছে। [তারীখে তাবারী-৫/৩৮৯] কুফায় এখন নতুন গভর্ণর উবাদুল্লাহ বিন যিয়াদ।

সে কঠোরতার সাথে রাষ্ট্রের সাথে বিদ্রোহকারী ও সহযোগীদের দমন করছে। সেই সাথে হুসাইন রাঃ জেনে গেলেন কুফার শিয়াদের প্রতারণা ও গাদ্দারী সম্পর্কেও। যারা চিঠি দিয়ে, দাওয়াত দিয়ে, বড় বড় ওয়াদা দিয়ে কুফায় দাওয়াত দিয়েছিল তাদের। কিন্তু মুসলিম বিন আকীলকে একা রেখে সবাই পালিয়েছে। এমন কি তিনি এতোটাই অসহায় ও নিঃসঙ্গ হয়ে গিয়েছিলেন যে, রাস্তা জিজ্ঞাসা করার মত কোন সাথী পর্যন্ত পাননি। অবশেষে কথিত শিয়ানে আলীদের সংবাদের ভিত্তিতেই গ্রেফতার হয়ে নির্মমভাবে শাহাদত বরণ করেন মুসলিম বিন আকীল। হযরত মুসলিম বিন আকীল মুহাম্মদ বিন আশআছকে হুসাইন রাঃ এর কাছে তার পক্ষ থেকে এ সংবাদ বলেন যে, তুমি পরিবার পরিজন নিয়ে ফিরে যাও। তুমি কুফাবাসীর ধোকায় পড়ো না। কেননা এরাই তারা যারা নিজেদের আপনার পিতার সাথী পরিচয় দিতো। যাদের থেকে মুক্তি পেতে আপনার পিতা মরে যেতে বা নিহত হওয়ার তামান্না করতেন। নিশ্চয় এ কুফাবাসী আপনার পিতার সাথে মিথ্যা বলেছে এবং আমার সাথেও মিথ্যা বলেছে। হুসাইন রাঃ মুসলিম বিন আকীলের উক্ত সংবাদ শুনে কুফাবাসীর গাদ্দারী বুঝে যান। তাই তিনি ফিরে যেতে মনস্ত করলেন। কিন্তু যখনি তিনি ফিরে যাবার প্রস্তুত নিচ্ছেন তখন মুসলিম বিন আকীলের যে স্বজনরা তার সফরসঙ্গী ছিলেন তারা জোশের সাথে বলতে লাগলেন: "আল্লাহর কসম! আমরা যতক্ষণ পর্যন্ত মুসলিম বিন আকীলের খুনের বদলা না নিবো, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা ফিরে যাবো না। যদিও সবাই শহীদ হয়ে যাই"। একথা শুনে হুসাইন রাঃ বললেন, তোমাদের ছাড়া আমার বেঁচে থেকে কী ফায়দা? হুসাইন রাঃ মুসলিম বিন আকীলের শহীদ হবার খবর শুনে ফিরে যাবার বিষয়টি শিয়াদের লিখিত গ্রন্থাবলীতেও স্পষ্ট শব্দে উদ্ধৃত হয়েছে। যেমন: জালাউল উয়ূন, মোল্লা বাকের মাজলিসীকৃত-১/২৬৩, নাসেখুল তাওয়ারীখ, লিসানুল মূলক মীর্যা মুহাম্মদ তকীকৃত-২/৩২১]

হুর বিন ইয়াযিদের পরামর্শ

হুর বিন ইয়াযিদ একজন ভদ্রলোক ছিলেন। তিনি হযরত হুসাইন রাঃ এর কল্যাণকামী ছিলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, কোথায় যাচ্ছেন?যখন কুফায় যাবার কথা শুনলেন, তখন খুব শক্তভাবে যেতে বারণ করলেন। বললেন, আপনি ফিরে চলে যান, সেখানে আপনার জন্য কল্যাণের আশা নেই। এসব শুনে হযরত হুসাইন রাঃ কুফায় না গিয়ে দামেশকে গিয়ে ইয়াযিদের সাথে সাক্ষাৎ করার মনস্থ করলেন। তিনি এ সিদ্ধান্তে এতোটাই অটল ছিলেন যে, তিনি তৎক্ষণাৎ কুফার রাস্তা পাল্টে শামের দিকে রওনা করলেন। এর কারণ ছিল এই যে, হযরত হুসাইন রাঃ নিজের জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তা দিয়ে বুঝে গেলেন যে, ইয়াযিদের খেলাফত

আসলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। কুফার শিয়ারা তাকে ভুল তথ্য দিয়ে এখানে টেনে এনেছে। একটি প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের বিরোধীতা করাটা রাষ্ট্রদ্রোহীতার শামিল। সুতরাং তিনি শরয়ী সীমায় থেকে বিকল্প পন্থাকে বেছে নিলেন। চাইলেন যে, দামেশকে গিয়ে ইয়াযিদের সাথে মুলাকাত করতে। হতে পারে সরাসরি সাক্ষাতে ও আলাপচারিতায় উদ্দেশ্য অর্জিত হবে। হুসাইন রাঃ এর সিদ্ধান্ত দ্বারা একথাও বুঝা যায় যে, ইয়াযিদের খেলাফতের মৌলিক কিছু ত্রুটি থাকার পরও শরীয়তে সুযোগ থাকার কারণে উম্মতের একতা ও ভ্রাতৃত্বের খাতিরে যেসব সাহাবাগণ ইয়াযিদকে খলীফা মেনে নিয়েছে তাদের মতামতটিকে তিনি সম্মান জানাতেন। যদিও তিনি নিজে আজীমতের উপর আমল করেছেন। হুসাইন রাঃ এর কুফায় গমনটাও নেতৃত্ব দখল ছিল না। বরং সেই মৌলিক ভুলটিকে শোধরানো মাত্র। কুফায় গিয়ে তিনি লোকদের একত্র করে হয়তো একাজটিই করতে চাচ্ছিলেন। কিন্তু পরিস্থিতি পরিবর্তিত দেখে তিনি সরাসরি ইয়াযিদের সাথেই এ বিষয়ে খোলাখুলি আলোচনাকে জরুরী মনে করলেন। এছাড়া আর কোন রাস্তাও অবশ্য ছিল না। যদিও একথা স্পষ্ট ছিল যে, কুফা ও দামেশকের পলিসি একই হবে। উভয় স্থানেই হুসাইন রাঃ কে রাষ্ট্রদ্রোহী মনে করা হচ্ছে। কিন্তু হুসাইন রাঃ ইবনে যিয়াদের কঠোর নীতি দেখে তিনি বুঝে গেছেন যে, ইয়াযিদ আমার সাথে ইবনে যিয়াদের মত এমন কঠোরতা করবে না। কোন সিদ্ধান্ত নেবার আগে অন্তত আমার মতামত জানতে চাইবে। যা ইবনে যিয়াদের ক্ষেত্রে ভাবা যায় না। হযরতে হুসাইন রাঃ এর ইয়াযিদের দিকে যাওয়ার সিদ্ধান্তটি সঠিক ও যথার্থ ছিল। এ কারণেই হযরত হুসাইন রাঃ এর শাহাদতের পর ইয়াযিদ বলতেন যে, 'আমার কি বিগড়ে যেতো যদি আমি কিছু কষ্ট সহ্য করে নিতাম। হুসাইন রাঃ কে নিজের ঘরে ডেকে নিতাম। তিনি যা চান তাই নিতে তাকে ক্ষমতা দিতাম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আত্মীয় এর হক এর এটাইতো তাকাযা ছিল। যদিও তাতে আমার হুকুমতের শক্তি ও শওকত হ্রাসই পেতো'। হুসাইন রাঃ কুফার রাস্তা রেখে দামেশকের দিকে প্রায় ৪৫ মাইল সাড়ে ৭২ কিলোমিটার সফর করে কারবালা নামক স্থানে এসে পৌঁছে গেলেন। যা কুফা থেকে দামেশক যাবার মহাসড়কে অবস্থিত। ফুরাত নদীর পাড়ও ছিল নিকটে। [তারীখে তাবারী-৫/৩৯২] উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদ চাইলে হুসাইনী কাফেলাকে দামেশকের দিকে যেতে দিতে পারতো। কিন্তু সে তা করেনি। আফসোসের বিষয় হল, চরম ধৃষ্টতার সাথে সে হুসাইন রাঃ কে দামেশকের দিকে যেতে না দিয়ে গ্রেফতার করে তার কাছে নিয়ে আসার স্পর্ধাসূচক আদেশ জারী করে। প্রশ্ন হল, সে এমনটা করল কেন? তাহলে কি ইয়াযিদের পক্ষ থেকে হুসাইন রাঃ কে এভাবে গ্রেফতার করার নির্দেশ ছিল? বাস্তব কথা হল, হযরত হুসাইন রাঃ ইরাক সীমান্তে পৌঁছার পর থেকে দশে মহররম পর্যন্ত কুফা ও দামেশকের মাঝে কোন প্রকার যোগাযোগ ও কথোপকথন করা সম্ভব ছিল না। কারণ, কুফা ও দামেশকের মাঝে দূরত্ব হল ৯০৪ কিলোমিটার। যদি কোন দ্রুতগামী ঘোড়াও

প্রতিদিন একশ' কিলোমিটার সফর করে। তবু দামেশক পৌঁছতে নয় থেকে দশ দিন লেগে যাবে। আবার সেখান থেকে নতুন পয়গাম নিয়ে কুফা আসতেও এমন সময় লাগতো। এর মানে ইয়াযিদের কাছ থেকে কুফায় পয়গাম আসতে কমপক্ষে ১৮ কিংবা ১৯ দিনের দরকার। অথচ হুসাইন রাঃ ইরাক সীমান্তে আসার পর থেকে কারবালায় হত্যাযজ্ঞ পর্যন্ত ৫দিন সময়ও অতিক্রম করেনি। বরং ১০ই মুহররমই সকলকে শহীদ করে ফেলা হয়। এর দ্বারা পরিস্কার বুঝা যায় যে, কারবালা প্রান্তরে ইবনে যিয়াদ কর্তৃক হত্যাযজ্ঞে ইয়াযিদের সরাসরি কোন নির্দেশ ছিল না। বরং ইয়াযিদের আগের নির্দেশনা অনুপাতে সব ধরণের পদক্ষেপের জন্য নিজেকে উপযুক্ত মনে করে একক সিদ্ধান্তে সে তা করেছে। নতুন কোন নির্দেশের প্রয়োজন অনুভব করেনি। ইয়াযিদের আগের নির্দেশনা ছিল কুফাকে নিয়ন্ত্রণ করা। কুফার লোকজন পুরোপুরি নিয়ন্ত্রিত হয়ে গিয়েছিল। হযরত হুসাইন রাঃও পরিস্থিতি আচ করে কুফার বদলে দামেশকে যাবার জন্য যাত্রা শুরু করে দিয়েছেন। এর মানে হুসাইন রাঃ এর কারণে কুফায় কোন প্রকার অস্থিরতা হবার সুযোগই ছিল না।

তারপরও উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদ হুসাইন রাঃ কে দামেশক যেতে দিলো না কেন? তারতো এজন্য খুশি হবার কথা যে, সে তার দায়িত্বপ্রাপ্ত এলাকা পুরোপুরি শান্ত ও নিরাপদ রেখেছে। একটি পরীক্ষা থেকে নিজেকে বাঁচাতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু এরপরও সে কেন এমন পৈশাচিক কাজ করল?
আসলে ইবনে যিয়াদের কর্মকান্ড থেকে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, সে একজন কঠোর মানসিকতা সম্পন্ন কমান্ডার ছাড়া কিছু নয়। তার দৃষ্টিতে হযরত হুসাইন রাঃ ছিলেন রাষ্ট্রের বিরোধী একজন ভয়ানক বিদ্রোহী মাত্র। বিদ্রোহী চরম পর্যায়ের অপরাধী হয়ে থাকে। এমন অপরাধীকে ক্ষমা করা যায় না। এছাড়া তার মাথায় স্বৈরতান্ত্রিক দাপুটে শাসকের ভুতও সওয়ার হয়েছিল। সে যেভাবে মুসলিম বিন আকীল রাঃ এবং হুর বিন উরওয়াকে প্রকাশ্যে নির্মমভাবে হত্যা করেছে। তেমনি হুসাইন রাঃ কে হত্যা করে নিজের ক্ষমতার ত্রাস সৃষ্টি করতে চেয়েছে। যাতে করে ভবিষ্যতে আর কেউ রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার সাহস করবেতো দূরে থাক কল্পনাই করতে না পারে। যদি ইবনে যিয়াদের শুধুমাত্র তার দায়িত্বপ্রাপ্ত কুফার ষড়যন্ত্রকারীদেরই নির্মূল করাই মাকসাদ হতো, তাহলে নুমান বিন বশীর রাঃ কে বরখাস্তকরণ এবং কুফায় তার নিয়োগ, আহলে ইরাকের উপর পূর্ণাঙ্গ আধিপত্য, মুসলিম বিন আকীল ও হুরকে হত্যা করার সংবাদ হযরত হুসাইন রাঃ এর কাছে পৌঁছতে দিতো। যাতে করে হুসাইন রাঃ কুফায় আসার চিন্তাই বাদ দিয়ে দেন। কিন্তু হযরত হুসাইন রাঃ পর্যন্ত উপরোক্ত পট পরিবর্তনের সংবাদ না পৌঁছানোর জন্য শহরের সীমান্ত জুড়ে কড়া অবরোধ আরোপ করে সেই পথকে রুদ্ধ করে দিয়েছে। ফলে হযরতে হুসাইন রাঃ সঠিক সময়ে

সংবাদই পাননি। এ কারণেই হযরত হুসাইন রাঃ কুফার সীমান্তে এসে গেছেন। আসলে ইবনে যিয়াদ এটাই চাচ্ছিল যে, হযরতে হুসাইন রাঃ বেখবর অবস্থায় কুফায় আসবেন আর তাঁকে অপ্রস্তুত অবস্থায় গ্রেফতার করা হবে। সে যেন এটাই প্রমাণ করতে চেয়েছে যে, সে কতবড় রাজনীতিবীদ! কত শক্তিমান শাসক। হযরত হুসাইন রাঃ এর মত ব্যক্তিত্বকে নিজের জালে আটকে ফেলেছে। এজন্যই সে সীমান্তবর্তী টহল বাহিনীকে অর্ডার দিয়ে রেখেছিল যে, হযরত হুসাইন রাঃ আসার সাথে সাথে দ্রুত গ্রেফতার করে যেন তার দরবারে নিয়ে আসা হয়। কিন্তু হযরত হুসাইন রাঃ এ নির্দেশ মানতে অস্বিকার করেন। সেনা কমান্ডার হুর বিন ইয়াযিদ নবী পরিবারের প্রতি মোহাব্বত, তার কোমল হৃদয়ের কারণে হুসাইন রাঃ কে গ্রেফতার না করে চলে যেতে সুযোগ করে দেন।

উমর বিন সা'দের কারবালা রওনা

ইবনে যিয়াদ এবার উমর বিন সা'দকে তেহরানের গভর্ণরী দেবার আশ্বাস দিয়ে হুসাইন রাঃ কে নিঃশর্তে গ্রেফতার করার দায়িত্ব অর্পণ করে। আদেশ করে, যদি হুসাইন রাঃ স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ না করেন তাহলে যেন হত্যা করা হয়। যেহেতু হুসাইন রাঃ এর মত ব্যক্তিত্বের উপর হাত উঠানো কিয়ামত পর্যন্তের জন্য বদনামীর কারণ হবে, তাই উমর বিন সা'দ এ দায়িত্ব গ্রহণে অক্ষমতা প্রকাশ করেন। কিন্তু ইবনে যিয়াদ তার বাড়ি ঘর ধ্বংস করা এবং গর্দান উড়িয়ে দেবার হুমকি প্রদান করে। উমর বিন সা'দ সকাল পর্যন্ত ভাবার জন্য সুযোগ চায়। সারা রাত চিন্তা করে সকালে সম্মতি জানিয়ে বাহিনী নিয়ে কারবালা প্রান্তরে পৌঁছে যায়। [তারীখে তাবারী-৫/৩৮৯] কারবালা প্রান্তর হিজরী ৬১ হিজরীর ৯ই মহররম। কারবালা প্রান্তরে সরকারী বাহিনীর অফিসার উমর বিন সা'দ, শিমার বিন জিলজাওশান এবং হুসাইন বিন নুমাইরের সাথে হযরত হুসাইন রাঃ এর আলোচনা হয়। হযরত হুসাইন রাঃ তাদেরকে আল্লাহ ও ইসলামের ওয়াস্তা দিয়ে বলেন, আমাকে আমীরুল মু'মিনীন ইয়াযিদের কাছে যাবার সুযোগ দিন। আমি আমার হাত তার হাতে দিয়ে দেবো। কিন্তু ইবনে যিয়াদের পক্ষ থেকে হযরত হুসাইন রাঃ কে শর্তহীনভাবে গ্রেফতার করার আদেশ ছিল। তাই সেনাপ্রধান জবাব দিল,এছাড়া কোন পথ নেই যে, আপনি সিদ্ধান্তের জন্য নিজেকে ইবনে যিয়াদের কাছে আত্মসমর্পণ করুন।

হুসাইন রাঃ এর তিন প্রস্তাব

যখন সকল পথ রুদ্ধ হতে দেখলেন তখন হুসাইন রাঃ দ্বিতীয় পন্থা অবলম্বন করে তিনটি প্রস্তাব পেশ করেন। যথা- ১. আমি যেখান থেকে এসেছি সেখানেই ফেরত যাবার সুযোগ দেয়া হোক।

২. ইয়াযিদের কাছে যাবার সুযোগ দেয়া হোক। যেন তার হাতে বাইয়াত হতে পারেন। তাদের ভিতরকার মতভেদ যেন দূরিভূত হয়ে যায়। ৩. ইসলামী রাষ্ট্রের সীমান্তে পৌঁছে দেয়া হোক। যেন তিনি অন্যান্য মুসলমানদের মতই জীবন যাপন করতে পারেন। উমর বিন সা'দ এ প্রস্তাব মেনে নেয়। উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদকে এ বিষয়ে জানায়। কিন্তু ইবনে যিয়াদ তা অস্বিকার করে। শর্ত ছাড়া গ্রেফতার করার জন্য জোর নির্দেশ প্রদান করে। উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদ প্রথমত হযরত হুসাইন রাঃ এর প্রস্তাব মেনে নিতে চাইলেন। কিন্তু শিমার বিন জিলজাওশান তাকে বুঝায় যে, শর্তহীন গ্রেফতারটাই সঠিক সিদ্ধান্ত। যাতে করে সব কিছু হুকুমতের অধীন থাকে। শিমার উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদকে বলে, আল্লাহ দুশমনকে আপনার কাবুতে এনে দিয়েছেন। আপনি তাকে ছেড়ে দিতে চাচ্ছেন? শিমারের কথা শুনে প্রভাবিত হয়ে উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদ হুসাইন রাঃ এর শান্তি প্রস্তাব বাতিল করে দেয়। শর্তহীন আত্মসমপর্ণের জন্য হুসাইন রাঃ কে বলা হয়। কিন্তু এভাবে অসহায় আত্মসমর্পণ কেবল নবী পরিবারের অসম্মানই নয়, বরং সেই মহান উদ্দেশ্যও ধুলায় মিশে যায়, যে উদ্দেশ্য সফলের লক্ষ্যে নিজের পরিবারের সদস্য পর্যন্ত ঝুঁকির মুখে নিক্ষেপ করেছেন। এ কারণে তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দেন যে, কিছুতেই তিনি শর্তহীন আত্মসমর্পণ করবেন না। এখানে এ বিষয়টি অনেকের কাছেই আশ্চর্যের যে, হুসাইন রাঃ ইয়াযিদের হাতে বাইয়াত হতে রাজী হবার পরও কেন ইবনে যিয়াদের কাছে বাইয়াত হতে রাজী হননি? অথচ ইবনে যিয়াদতো নিজের বাইয়াত নয়, বরং ইয়াযিদের আনুগত্বেরই বাইয়াত গ্রহণ করতো। আসলে যারা এমনটি ধারণা করে থাকেন, তারা হুসাইন রাঃ এর মূল লক্ষ্য সম্পর্কে ভ্রুক্ষেপ না করার কারণেই এমন প্রশ্ন করছেন। তারা হুসাইন রাঃ কে সাধারণ ক্ষমতালোভী সাধারণ কেউ মনে করছে। নাউজুবিল্লাহ। তারা এমনটা মনে করছেন যে, হুসাইন রাঃ শুধুমাত্র প্রাণরক্ষার তাগিদে ইয়াজিদের হাতে বাইয়াত হতে রাজী হয়ে গেলেন। যে বাইয়াতের তিনি শুরু থেকে বিরোধী ছিলেন। যদি তিনি প্রাণরক্ষার জন্যই এমনটি করে থাকেন, তাহলে নিজের চেয়ে চারগুণ বেশি প্রশিক্ষিত রাষ্ট্রীয় সৈন্যের বিপরীতে কেন মাথা ঝুঁকাননি? কেন নির্মমভাবে মাথা উঁচু করে কারবালা প্রান্তরে শাহাদতের পেয়ালা পান করেছেন? আসল বিষয় হল, হযরত হুসাইন রাঃ শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নিজের আজমত ও ইজতিহাদী অবস্থানের উপর অটল ছিলেন। তিনি যেহেতু কুফী শিয়াদের পত্র ও দূতদের মাধ্যমে জেনেছেন যে, কুফীরা সবাই হুসাইন

রাঃ এর অপেক্ষায়। তারা কেউ ইয়াযিদের পক্ষে নয়। তারা হুসাইন রাঃ এর নেতৃত্ব চায়। আর ইয়াযিদের ক্ষমতায় আরোহন পদ্ধতি পূর্ববর্তী খলীফাগণের স্বীকৃত পদ্ধতিতে ছিল না। তাই এ পদ্ধতির সংস্কার প্রয়োজন। যাতে করে এটি প্রচলিত হয়ে বংশীয় শাসনের ধার চালু হয়ে না যায়। এ দু'টি মৌলিক বিষয়কে সামনে রেখে হযরতে হুসাইন রাঃ কুফায় আগমণ করেন। এসে যখন দেখলেন যে, কুফার শিয়ারা মিথ্যা বলেছে। আসলে পুরো ইরাক ইয়াযিদের খেলাফত মেনে নিয়েছে। তারা সকলেই ইয়াযিদের ঝান্ডার নিচে ঐক্যবদ্ধ। কেউ ইচ্ছেয়, কেউ অনিচ্ছায়। কিন্তু সকলেই ইয়াযিদের নেতৃত্ব ও হুকুমত মেনে নিয়েছে। আর চিঠি লেখক কুফীরা। যারা নিজেদের শিয়া দাবী করেছে এরা সকলেই গাদ্দারী করে পলায়ন করেছে। তখন তিনি সরাসরি ইয়াযিদের সাথে সাক্ষাৎ করে তার হাতে বাইয়াত হতে চাইলেন। যাতে করে তার মূল উদ্দেশ্য বিষয়ে সরাসরি কথা বলে একটি সুরাহা বের করতে পারেন। যা রাজনৈতিক সন্ধি হবে। এ সন্ধির ক্ষমতা কেবল ইয়াযিদের হাতেই আছে। উবায়দুল্লাহ যিয়াদের হাতে নেই। কারণ, সে কেবল একজন গভর্ণর। ইয়াযিদের হুকুমের গোলাম। এ কারণে তার হাতে বাইয়াত হয়ে কোন লাভ নেই। তাছাড়া সে নিঃশর্ত বাইয়াত নিয়ে হুসাইন রাঃ এর মূল উদ্দেশ্যের উপরই পানি ফেলে দিচ্ছিল। এ কারণে হযরতে হুসাইন রাঃ তার আদর্শের জন্য শহীদ হতে রাজী হলেন, কিন্তু আদর্শ বিসর্জন দিতে রাজী হলেন না

কারবালার যুদ্ধ কি ইসলাম ও কুফরের যুদ্ধ ছিল?

হযরত হুসাইন রাঃ ও উমর বিন সা'দ এর মধ্যকার আলোচনা এবং হুসাইন রাঃ এর তিন প্রস্তাবের দিকে একটু ভালো করে নজর বুলালে আমাদের কাছে অনেক কিছু পরিস্কার হয়ে যায়। ক) ইয়াযিদের হাতে বাইয়াত হতে চাওয়া। খ) ইয়াযিদের শাসনকৃত রাষ্ট্রকে ইসলামী রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া। গুরুত্বপূর্ণ এ দু'টি বিষয় এতে চলে আসছে। এর মানে ইয়াযিদের নিয়োগ পদ্ধতি হুসাইন রাঃ এর পছন্দ না হলেও, তিনি ইয়াজিদের শাসনকে কুফরী শাসন মনে করতেন না। তার হাতে বাইয়াত হওয়াকে কাফেরের হাতে বাইয়াত মনে করতেন না। আর কারবালায় আগমণ ইসলাম ও কুফরীর পার্থক্য নির্ণয়ক বিষয় ছিল না। যদি ইয়াযিদ তখন পর্যন্ত কাফের হতো। ইসলাম বিকৃতকারী হতো। ইসলামের দুশমন হতো। নবীজীর দুশমন হতো। তাহলে হুসাইন রাঃ কিভাবে তাকে আমীরুল মুমিনীন বলেন? কিভাবে তার হাতে বাইয়াত হতে বলেন? কিভাবে তার অধীনত রাষ্ট্রকে ইসলামী রাষ্ট্র বলেন? তাহলে কি হুসাইন রাঃ কাফেরের হাতে বাইয়াত হতে চেয়েছেন? ইসলাম বিকৃতকারী, ইসলামের দুশমনের হাতে বাইয়াত হতে চাইলেন? অবশ্যই নয়। হতেই পারে না। হ্যাঁ। একথা ঠিক যে,

ইয়াযিদের কারবালা ঘটনায় সম্পক্তৃতা এবং পরবর্তীতে হাররার ঘটনা ইত্যাদির মাধ্যমে ফাসেকী পরিস্কার হয়ে যায়। তার ঘৃণ্য চেহারা ফুটে উঠে। যা হুসাইন রাঃ এর কুফায় আগমণ পর্যন্ত পরিষ্কার ছিল না।

যুদ্ধ যেভাবে শুরু

কথাবার্তা শেষ হয়ে যাবার পরও উমর বিন সা'দ যুদ্ধ না করার চেষ্টা করে যাচ্ছিলেন। কিন্তু ইবনে যিয়াদ কুফায় বসে পুরো পরিস্থিতির ক্ষণে ক্ষণে সংবাদ রাখছিল। সে কড়া নির্দেশ প্রদান করে জুআইরিয়া বিন বদর তাইমীকে পাঠায় যে, উমর বিন সা'দকে বল যে, দ্রুত হামলা করতে, নতুবা তাকে হত্যা করা হবে। উমর বিন সা'দ সেদিন সুযোগ দিল হুসাইন রাঃ কে চিন্তা ভাবনা করার জন্য। পরদিন উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদের কড়া নির্দেশ পাবার পর উমর বিন সা'দ হাতিয়ার নিল এবং যুদ্ধ শুরু করার ঘোষণা দিল। [তারীখে তাবারী-৫/৩৯২] ৬১ হিজরীর মহররম মাসের ১০ তারিখ। শুক্রবার মতান্তরে শনিবার উমর বিন সা'দ তার সঙ্গীদের নিয়ে ফজরের নামায শেষে যুদ্ধের জন্য সারি বেধে দাড়িয়ে গেল। উল্লেখ্য যে, সে দিন ছিল আশুরার দিন। এদিকে হযরত হুসাইন রাঃ ও তার সঙ্গীদের নিয়ে নামায পড়লেন। আর তারা ছিলেন বত্রিশজন অশ্বারোহী এবং চল্লিশ পদাতিক যোদ্ধা। এরপর তিনি তাদেরকে সারিবদ্ধ করলেন। ডানপাশের কমান্ডার বানালেন যুহাইর বিন কায়সকে আর বাম পাশের জন্য নির্ধারণ করলেন হাবীব বিন মুতাহহারকে। তার ঝাণ্ডা প্রদান করলেন তার ভাই আব্বাস বিন আলীকে। আর তাদের সঙ্গের মেয়েদেরকে তাবুগুলিতে তাদের পেছনে নিয়ে আসলেন। এদিকে হুসাইন রাঃ এর নির্দেশমত রাতেই তারা তাদের তাবুর পেছনে পরিখা খনন করে তাতে জ্বালানি কাঠ, বাশ ইত্যাদি ফেলে রেখেছিলেন। এরপর তাতে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়েছিল। যাতে করে পেছন থেকে কেউ তাবুর কাছে ঘেষতে না পারে। আর উমর বিন সা'দ তার বাহিনীর ডান পার্শের কমান্ডার বানালো আমর বিন হাজ্জাজ আয যুবাইদীকে। বাম পাশের জন্য শিমার বিন জুলজাওশানকে। অশ্বারোহী বাহিনীর নেতৃত্বে ছিল আযরাহ বিন কায়স আল আহমাসী। আর পদাদিক বাহিনীর নেতৃত্বে ছিল শাবীছ বিন রিবয়ীর। আর ঝান্ডা ছিল ওয়ারদানের হাতে উভয় পক্ষ স্ব স্ব স্থানে স্থির হয়ে থাকলো। (আলবিদায়া)

হুসাইন রাঃ এর গায়ে মোটা জোব্বা ছিল। উমর বিন সা'দের বাহিনীর উমর তাহয়ী নামক সৈন্য তীর ছুড়ল। তীর গিয়ে হুসাইন রাঃ এর কাধে এসে আঘাত করল। এ সময় কুফার ঘোরসওয়ার বাহিনীর কমান্ডার হুর বিন ইয়াযিদের বিবেক জাগ্রত হয়ে উঠল। সে

সৈন্যবাহিনীর যুদ্ধাংদেহী মনোভাব দেখে তিরস্কার করে বলতে লাগল, তোমরা কি হুসাইন রাঃ এর আবেদন গ্রহণ করবে না? আল্লাহর কসম! যদি এমন দরখাস্ত তুর্কিস্তান ও দায়লামের কাফেররাও করতো, তাহলে তা তোমাদের জন্য রদ করা জায়েজ হতো না। এতে করে সৈন্যদের মাঝে কোন প্রভাব সৃষ্টি হয়নি। তখন তিনি নিজ বাহিনী ছেড়ে হুসাইন রাঃ এর বাহিনীর দিকে এগিয়ে গেলেন। তাদের সাথে শরীক হয়ে গেলেন। তার পূর্ব আচরণের জন্য হুসাইন রাঃ এর কাছে ক্ষমা চাইলেন। বলেন, আমি যদি আগে তাদের ইচ্ছের কথা জানতাম, তাহলে আমি আপনার সাথে ইয়াযিদের কাছে যেতাম। এরপর তিনি বাহিনীর সামনে এসে উমর বিন সা'দকে বললেন, দুর্ভাগ্য! তোমাদের নবীর দৌহিত্রের প্রস্তাবিত তিনটি বিষয়ের একটিও কি তোমরা গ্রহণ করবে না? তখন সে বলল, তা গ্রহণ করার ক্ষমতা যদি আমার থাকতো, তাহলে আমি তা গ্রহণ করতাম। [আলবিদায়া ওয়াননিহায়া-৮/১৮০, ৮/৩৩৬] তারপর যুদ্ধ শুরু হল। হুর বিন ইয়াযিদ ইবনে যিয়াদের বাহিনীর উপর হামলা করলেন। দুইজন সৈন্যকে হত্যা করে নিজেও শহীদ হয়ে গেলেন।

হুসাইন রাঃ কে অপমান

হুসাইন রাঃ কে অপমান যুদ্ধকালে এক বদবখত দাড়িয়ে আওয়াজ দিল: তোমাদের মাঝে কি হুসাইন আছে? উত্তর আসল: আছে। তখন সে বলল, তাকে জাহান্নামের সুসংবাদ দাও। হযরত হুসাইন রাঃ শুনে বললেন, না। বরং আল্লাহ তাআলা ক্ষমাকারী। তিনি মেহেরবান এবং দয়ালু। যার আনুগত্য করা হয়। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা, তুমি কে?সে বলল, আমি হাওজা এর ছেলে। তখন তিনি অবচেতনে বলে ফেললেন, হে মালিক! তাকে জাহান্নামে টেনে নাও। সে সময় তার ঘোড়া আচমকা ছুটতে শুরু করে। ফলে ঘোড়া থেকে পড়ে যায়। তার পা রিকাবে আটকে যায়। ঘোড়া তাকে ছেচড়াতে ছেচড়াতে নিয়ে চলে। এর ফলে তার পুরো শরীর টুকরো টুকরো হয়ে যায়। রেকাবে শুধু তার পা দু'টি বাকি থাকে।

আব্দুল্লাহ এর শাহাদত

হযরত হুসাইন রাঃ এর ছেলে আব্দুল্লাহ। অত্যান্ত সুন্দর চেহারার অধিকারী ছিলেন। এক কুফী সৈন্য তাঁকে দেখে বলল, তাকেতো আমি অবশ্যই হত্যা করবো। অন্যান্যরা বুঝাল যে, এমন ছোট্ট নাবালেগ শিশুকে হত্যা করে তোর কী ফায়দা? কিন্তু সেই কুফী তার উপর হামলা

করল এবং তাকে হত্যা করল। যখন তার উপর আঘাত করছিল, তখন আব্দুল্লাহ চিৎকার বলে উঠলেন, হে চাচা! হযরত হুসাইন রাঃ আওয়াজ শুনে বলতে লাগলেন,এমন ব্যক্তির আওয়াজে লাব্বাইক, যার সাহায্যকারী কম কিন্তু শত্রু অনেক বেশি। হুসাইন রাঃ হামলাকারীর উপর আক্রমণ করে এক আঘাতে তার এক হাত এবং আরেক আঘাতে তাকে হত্যা করেন। তারপর আম লড়াই শুরু হয়ে গেল। [আলমিহান-১৫৪] চিঠিদাতা শিয়া কুফীদের গাদ্দারী হুসাইন রাঃ যখন কুফার বদলে দামেশক যেতে প্রস্তুত হয়ে গেলেন। তখন কুফী শিয়ারা চোখেমুখে অন্ধকার দেখতে শুরু করে। তাদের মূল মাকসাদ ছিল হুসাইন রাঃ কে ভুল বুঝিয়ে কুফায় এনে একটি হাঙ্গামা সৃষ্টি করা। কিন্তু হুসাইন রাঃ পরিস্থিতি বুঝে যান। চিঠি লেখক শিয়াদের মিথ্যাচার নিজ চোখে অবলোকন করেন। শিয়াদের লক্ষ্য করে হুসাইন রাঃ এর বক্তব্য আমরা শিয়াদের গ্রন্থ্ থেকে একটু দেখে নেই: হুসাইন রাঃ কুফীদের লক্ষ্য করে বলেন, আফসোস! তোমরাতো ঐ লোক! যারা আমার পিতা হযরত আলী রাঃ কে ধোকা দিয়েছো। তারপর তাকে শহীদ করেছো। তারপর আমার ভাই হাসান রাঃ কে আহত করেছো। আমার চাচাতো ভাই মুসলিম আকীল রাঃ কে কুফায় কতল করেছো। সত্য কথা হলো, যারাই তোমাদের প্রতারণায় ফেসে গেছে তারা বড় আহমক। [জালাউল উয়ূন] হুসাইন রাঃ বলেন, হে জনতা! তোমরা যেন ধ্বংস হও। দুর্দশাগ্রস্ত হও। তোমরা উৎসাহের সাথে আমাদের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলে তোমাদের সাহায্য করার জন্য এবং আমরা তা করার জন্য দ্রুত অগ্রসর হয়েছি। কিন্তু তোমরা এখন সে তরবারিগুলো কোষমুক্ত করেছো যা আমরা তোমাদের দিয়েছি এবং তোমরা আমাদের জন্য আগুন জ্বালিয়েছো যা আমরা তোমাদের ও আমাদের শত্রুদের জন্য জ্বালিয়েছিলাম। তোমরা তোমাদের শত্রুদের পক্ষ নিয়েছো এবং তাদের সাথে থেকে তোমাদের বন্ধুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য অগ্রসর হয়েছো। [শোকার্তের দীর্ঘশ্বাস-১/১৯৯-২০০] হুসাইন রাঃ এর আরেকটি বক্তব্য আসছে শিয়াদের গ্রন্থে: হে কুফার লোকেরা, তোমাদের মায়েরা তোমাদের হারাক। তোমরা আল্লাহর সৎকর্মশীল বান্দাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলে, এরপর যখন তিনি তোমাদের কাছে এলেন, তোমরা তাকে শত্রুর হাতে তুলে দিলে। অথচ তোমরা তার জীবন রক্ষার্থে জীবন দিতে চেয়েছিলে। এখন তোমরা তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে দিয়েছো তাকে হত্যা করার জন্য। তোমরা তাকে আটক করেছো এবং তার জামার কলার ধরেছো এবং তাকে চারদিক থেকে ঘেরাও করেছো, যেন তিনি আল্লাহর প্রশস্ত শহরগুলোতে পালিয়ে যেতে না পারেন। [শোকার্তের দীর্ঘশ্বাস-১/২০৭-২০৮] হযরত হুসাইন রাঃ চিঠি প্রদান করে কুফায় দাওয়াতদাতা এসব শিয়া নামধারী গাদ্দারদের পল্টিবাজী দেখে দামেশক যাবার মনস্ত করেন। কিন্তু এসব গাদ্দাররা তখন তাদের ষড়যন্ত্র ফাস হয়ে যাবার আতংকে পড়ে যায়। কারণ, হুসাইন রাঃ এর সাথে তাদের চিঠি ছিল। যাতে তাদের নামও ছিল। যারা হুসাইন রাঃ কে কুফায় এসে তাদের বাইয়াত নিয়ে বিদ্রোহ করার প্ররোচনা

দিয়েছিল। এখন দামেশকে গিয়ে এসব ইয়াযিদকে দেখালে এসব চিঠি লেখকরা সব রাষ্ট্রদ্রোহী হিসেবে বিচারের মুখোমুখি হবে। তাই তারা কিছুতেই চাচ্ছিল না যে, হুসাইন রাঃ দামেশকে যান। তাই তারা দ্রুতই হুসাইন রাঃ এর দলত্যাগ করে তাকে হত্যায় সহযোগিতা শুরু করে। যাতে করে তাদের গাদ্দারীর প্রমাণ বাকি না থাকে। কুফার কিছু লোকেরা কারবালা প্রান্তরের বিভিন্ন উচু স্থানে দাঁড়িয়ে দৃশ্য দেখছিল।

যুদ্ধের পরিসমাপ্তি

হুসাইন রাঃ এর সহায়তার জন্য আল্লাহর কাছে দুআও করতে ছিল। যেন আসমান থেকে সাহায্য এসে হুসাইন রাঃ কে উদ্ধার করে। কিন্তু নিজেরা কিছুই করতে রাজী নয়। তখন একজন ওদের বলে যে, আরে আল্লাহর দুশমনেরা! একটু নিচে এসে হুসাইন রাঃ কে সাহায্য করছো না কেন?কিন্তু তারা কোন উত্তরও না দিতে পারলো না। সাহায্য করতে এগিয়েও এলো না। হযরত হুসাইন রাঃ এর শাহাদত হুসাইন রাঃ এর সাথে শ'য়ের কাছাকাছি লোক ছিল। তাদের মাঝে হযরত আলী রাঃ এর ৫ ছেলে। বনু হাশেমের ১৬ জন। বনু সালীম এবং বনু কেনানার এক এক দল ছিল। ইবনে উমর বিন যিয়াদ নামের এক ব্যক্তিও শামিল ছিল।অবশেষে এ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে সরকারী বাহিনীর হাতে হযরত হুসাইন রাঃ এর সকল সাথীবর্গ শহীদ হয়ে যান। যাদের মাঝে দশজন যুবক হুসাইন রাঃ এর নিজের ঘরের ছিলেন। এক তীর এসে হুসাইন রাঃ এর কোলের শিশুর গায়ে এসে লাগে। এতে উক্ত কোলের শিশুটিও শাহাদত বরণ করেন। হুসাইন রাঃ শিশুটির শরীর থেকে রক্ত মুছতে মুছতে বললেন, হে আল্লাহ! আমাদের এবং তাদের মাঝে তুমিই ইনসাফ কর। ওরা আমাদের এজন্য ডেকেছে যে, তারা আমাদের সাহায্য করবে। কিন্তু ওরা এখন আমাদের হত্যা করছে। হযরত হুসাইন রাঃ এর এ দৃঢ় বিশ্বাস হয়ে যায় যে, ওরা শুধু হত্যা করেই ক্ষান্ত হবে না। গায়ের কাপড় খুলে বেইজ্জাত করতে চাইবে। তাই তিনি তাঁবুতে ফিরে গেলেন। বললেন, আমাকে এমন একটা কাপড় দাও, যা কেউ ছিনিয়ে নিতে পছন্দ করবে না। যাতে করে কাপড় খুলে নিলেও কম দামী উক্ত চাদরটি যেন শরীরে রেখে যায়। একদম উলঙ্গ করে না ফেলে। তারপর তিনি একটি পুরাতন চাদর জামার নিচে পরিধান করলেন। তারপর তলোয়ার হাতে বেরিয়ে এলেন। দিনের দীর্ঘ সময় পর্যন্ত ইয়াযিদ বাহিনীর সৈন্যরা হযরত হুসাইন রাঃ কে হত্যার সুযোগ পেয়েও করছিল না। এর কারণ হল, তাদের কেউ হুসাইন রাঃ কে হত্যার দায় নিতে চাচ্ছিল না। একজন চাচ্ছিল অন্যজন হত্যা করুক। অবশেষে শিমার জিলজাওশান সৈন্যদের আহবান করে বলল, তাঁকে হত্যার ব্যাপারে তোমাদের কিসের অপেক্ষা? তখন যুরআন বিন শারীক

তামীমী হুসাইন রাঃ এর দিকে অগ্রসর হয়ে কাঁধে তরবারী দ্বারা আঘাত করল। এরপর সিনান বিন আনাস আমর নাখয়ী তাঁকে বর্শা দ্বারা আঘাত করল। তারপর ঘোড়া থেকে নেমে মাথা কেটে ফেলে। [আলবিদায়া ওয়াননিহায়া-৮/৩৫২] হুসাইন রাঃ বীরের মত লড়তে লড়তে কারবালা প্রান্তরে শাহাদাতের পেয়ালা পান করেন। নিকৃষ্ট খুনীরা হযরতের শরীর থেকে সকল কাপড় খুলে নেয় পুরাতন চাদরটি ছাড়া। শরীর থেকে মাথাকে আলাদা করে ফেলে। শিমার হযরত আলী আসগর তথা যাইনুল আবেদীন রহঃ কে হত্যা করতে উদ্যত হয়। তখন হুমায়দ বিন মুসলিম তাকে তা থেকে নিবৃত করে। কারণ, তখন তিনি অসুস্থ্য ছিলেন। এরপর সেনাপতি উমর বিন সা'দ এসে বলল, সবাই শুনে রাখ! কেউ যেন এ মেয়েদের তাঁবুতে প্রবেশ না করে এবং এই বালককে হত্যা না করে। আর যে তাঁদের কোন সামানপত্র নিয়েছে, সে যেন তা ফিরিয়ে দেয়। শুহাদায়ে কারবালা কারবালা প্রান্তরে হযরত হুসাইন রাঃ এর সাথে আবু তালেবের পরিবারের ১৮ জন ব্যক্তি শহীদ হন। ৬ জন হুসাইন রাঃ এর ভাই। যথা- ১) আব্বাস। ২) জা'ফর। ৩) উবায়দুল্লাহ। ৪) উসমান। ৫) মুহাম্মদ। ৬) আবু বকর। ২ জন হুসাইন রাঃ এর ছেলে। যথা ১) আব্দুল্লাহ। ২) আলী আকবর।

৩ জন হাসান রাঃ এর এর ছেলে। যথা- ১) কাসেম। ২) আবু বকর। ৩) আব্দুল্লাহ। ৩ জন আকীল বিন আবী তালেব রাঃ এর ছেলে (মুসলিম বিন আকীল রাঃ এর ভাই)। যথা - ১) জা'ফর। ২) আব্দুর রহমান। ৩) আব্দুল্লাহ। ২ জন আব্দুল্লাহ বিন জা'ফর বিন আবী তালেব রাঃ এর ছেলে। যথা- ১) আউন। ২) মুহাম্মদ। ২ জন আকীল রাঃ এর নাতি। যথা- ১) আব্দুল্লাহ বিন মুসলিম। ২) মুহাম্মদ বিন আবী সাঈদ বিন আকীল। উমর বিন সাঈদের সৈন্যদের ৮৮ জন নিহত হয়।

কারবালার শিক্ষা

ইয়াযিদের এ জয়লাভ বেশি দিন টিকে থাকেনি। মাত্র চার বছরের মধ্যে ইয়াযিদের মৃত্যু হয়। এর কয়েকদিনের মধ্যে মৃত্যু হয় তার পুত্রের। কারবালার এ মর্মান্তিক হত্যায় জড়িত প্রতিটি ব্যক্তি কয়েক বছরের মধ্যেই মুখতার সাকাফির বাহিনীর হাতে নির্মমভাবে নিহত হয়। এরপর ইয়াযিদের বংশের কেউ শাসন ক্ষমতা লাভ করেনি।

ইমাম হোসাইন (রা.) আজও সত্য ও ন্যায়ের প্রতীক হিসাবে মুসলিম উম্মাহর হৃদয়রাজ্যে বেঁচে আছেন। ইসলামের জন্য তার আত্মত্যাগ যুগের পর যুগ মুসলিম উম্মাহ্ শ্রদ্ধা ও ভক্তির সঙ্গে স্মরণ করবে।

ঐতিহাসিক কারাবালার শাহাদতের মাধ্যমে ইমাম হোসাইন (রা.) প্রমাণ করে গেলেন সত্য-মিথ্যা, ন্যায় ও অন্যায়, হক ও বাতিল কখনো এক হতে পারে না। সত্যের বিষয়ে কোনো ছাড় নয়, প্রয়োজনে শহিদ হতে হবে।